জীবন সাহারা

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

জীবন-সাহারা

সবিনয় নিবেদন,

গত সংখ্যায় শ্রীনিরঙ্কুশ চট্টোরাজের "জীবন-সাহারা" গল্পটি ছাপিয়াছি বলিয়া আপনি একসঙ্গে দুঃখিত এবং রাগান্বিত হইয়া আমাকে যে পত্রাঘাত করিয়াছেন; তাহার জবাবে লিখিতেছি।

আপনি লিখিয়াছেন আমার অতুলনীয় মাসিকের মূল্যবান পাঁচটি পৃষ্ঠা অমন জঘন্য গল্প, বিশেষ করিয়া এই কাগজ-দুর্ভিক্ষের দিনে, ছাপিয়া নষ্ট করিয়া আমি যে অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত শাস্তির বিধান পেনাল কোডে নাই, কিন্তু থাকা উচিত ছিল। লিখিয়াছেন "গল্পটি অশ্লীল নহে যে গোপনে পড়িয়া উপভোগ করিয়া প্রকাশ্যে না পড়িয়া নিন্দা করিব; হাসির নহে যে হাসিব; করুণ নহে যে কাঁদিয়া চোখের জলে রুমাল ভিজাইব। চট্টোরাজ মহাশয় গল্পটি কেন লিখিয়াছেন, তাহা যদি বা বুঝিতে পারি, আপনি কি কারণে তাহা আপনার কাগজে ছাপিলেন, তাহা বুঝিতে

পারার সাধ্য আমার নাই। গাধা না হয় নিজের গান রেকর্ড করাইতে গ্রামোফোন কোম্প্যানীতে গেল; তাই বলিয়া কি গ্রামোফোন কোম্পানী তাহার গান সযত্নে রেকর্ড করিয়া বাজারে ছাড়িবে?”………

আপনি আরো অনেক কিছুই লিখিয়াছেন যাহাতে আমি মনে বড় ব্যথা পাইয়াছি আমার নিজের জন্য নহে, চট্টোরাজ মহাশয়ের জন্য। আমি সম্পাদক মানুষ, বহু লেখকের গালি, অভিশাপ প্রভৃতি বাধ্য হইয়াই সহ্য করিয়াছি। একবার এক হতাশ লেখকের নিক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ডে আমার মাথাটী দ্বিখণ্ডিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এখনও আমার মাথার বাহিরে ও ভিতরে রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমার নিজের জন্য আমি কোন দুঃখ করি না। কিন্তু আপনি আমার নামে লেখা চিঠিতে লেখক চট্টোরাজের প্রতি যে চোখা চোখা বিষাক্ত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে চট্টোরাজের কিছু না হইলেও আমি যাতনায় জর্জর হইয়াছি।

আপনি আপনি না হইয়া অপর কেহ হইলে এমন করিয়া জবাব লিখিতে বসিতাম না। আপনি বলিয়াই বসিলাম। আমার পুরাতনতম গ্রাহক হিসাবে আপনার কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। চট্টোরাজের প্রতি আপনার যে জ্বলন্ত আক্রোশ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রশমিত না হইলে তাহার আত্মার হয়তো শান্তি হইবে না। তিনি আর ইহজগতে নাই।

আপনি লিখিয়াছেন, নিরঙ্কুশবাবুর গল্পটি সাহারা বিশেষ। জবাবে বলি গল্পটির বিশেষত্বই ঐখানে। নিরঙ্কুশবাবুর জীবনী আমি জানি বলিয়াই বলিতেছি তাহার জীবনটাই ছিলো একটি সাহারা বিশেষ এবং তাহার জীবনের সাহারাত্বই তাহার রচিত গল্পে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। "জীবন-সাহারা" গল্পটি একটি সার্থক রচনা এইজন্য যে, প্রকৃতপক্ষে ইহা লেখকের জীবনেরই একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি মাত্র। আপনি যে লিখিয়াছেন গল্পটির কোন অর্থ আপনি খুঁজিয়া পান নাই, তাহাও খুবই স্বাভাবিক, কেন না নিরঙ্কুশ চট্টোরাজ মহাশয়ও তাহার জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পান নাই।

আপনি চিঠিতে স্পষ্ট করিয়া না লিখিলেও আমার সন্দেহ হইতেছে আপনি হয়তো সন্দেহ করিতেছেন—চট্টোরাজ মহাশয়ের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আমার কোন সম্বন্ধ আছে অথবা তাঁহার নিকট হইতে আমি আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার ঘুষ পাইয়াছি। আমার মাসিক পত্রিকার দোহাই, বিশ্বাস করুন, আমি ঐ জাতীয় কোন কারণে গল্পটি ছাপি নাই। অবশ্য সাময়িক পত্রিকাদির সম্পাদকগণের মধ্যে এরূপ ব্যাপার কেহই যে করেন না তাহা নহে। আমি একটি মাসিক পত্রিকার কথা জানি, যাহাতে এমন জনৈক লেখকের গল্প নিয়মিত বাহির হইয়া থাকে, যাহার গল্প অন্য কোন কাগজে অনিয়মিতভাবেও কখনও বাহির হয় নাই। ভদ্রলোক তাহার গল্প ছাপাইবার জন্যই অনেক কায়দা করিয়া সম্পাদকের

সহিত একটা মধুর সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন ; ঐ সম্পর্কটি তুলিয়া বাংলা, হিন্দুস্থানী ও উর্দ্দু এই তিন ভাষাতেই গালি দেওয়ার রেওয়াজ আছে বলিয়া সম্পর্কটি উল্লেখ করিলাম না। ইঙ্গিতে বুঝিয়া লইবেন। কয়েকটি সাপ্তাহিক কাগজের কেলেঙ্কারিও জানি। ইহাদের অবিবেকী সংকীর্ণচেতা সম্পাদকগণ কয়েকজন লেখকের নিকট কালোবাজারের মাল সাদা দরে নিয়মিত পাইয়া থাকেন এবং তাহারই প্রতিদানে তাহাদের গল্প প্রায় নিয়মিতভাবেই ছাপিয়া থাকেন। তাহাদের বরাতে কি আপনার মত একজনও গ্রাহক বা পাঠক জোটে না ?

এই জাতীয় আরও অনেক সম্পাদকী গুপ্তকথা আমি জানি। আপনিও হয়তো আভাষে ইঙ্গিতে কিছু কিছু জানিয়াছেন। এবং জানিয়াছেন বলিয়াই আমার উপরও আপনার সন্দেহ হইয়াছে।

আপনি ইঙ্গিত দিয়াছেন এরূপ ব্যাপার ভবিষ্যতে আবার কখনো হইলে আপনি আর আমার কাগজের মুখদর্শন করিবেন না এবং আমারও আর আপনার বার্ষিক চাঁদার মুখ দর্শন করার সৌভাগ্য হইবে না। ইহাতে আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছি, আপনার চাঁদার টাকার জন্য নহে, আন্তরিক কারণে। আপনিই আমার কাগজের প্রথম গ্রাহক বলিয়া আপনার চেহারা না দেখিলেও আপনার প্রতি আমার একটা অন্তরের টান রহিয়াছে। আপনার সহিত আমার এই সংযোগ-সূত্র ছিন্ন হইলে আমি যে কী মর্মান্তিক ব্যথা পাইব, তাহা আপনাকে বুঝাইয়া

বলিবার ভাষা আমার নাই। আমি বরাবরই ভাবিয়া আসিয়াছি, আপনি আমার আগে মরিলে আপনার সচিত্র শোক-সংবাদ আমার মাসিকে ছাপিব, এবং আমি আপনার আগে মরিলে শেষ মুহূর্ত্তে পরমপিতার কাছে এই প্রার্থনা করিয়া যাইব—"আমার কাগজের যখন একটিও গ্রাহক ছিল না, সেই দুর্দিনে যে দরদী মহাত্মা আমার কাগজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জানিয়াও একসঙ্গে ছয় মাসের চাঁদা আগাম দিয়া গ্রাহক হইয়াছিলেন এবং সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-ভাবে গ্রাহকত্ব করিয়া আসিতেছেন, তাহাকে হে ঈশ্বর, তুমি দীর্ঘজীবী কর। পুত্র, কন্যা, কলত্র ইত্যাদি সহ তিনি সুখে কালাতিপাত করিতেছেন সন্দেহ নাই, এই নিদারুণ যুদ্ধের বাজারে, হে ঈশ্বর, তাহার পুত্রকন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাহার ব্যয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিও না।"

অতএব আমার কাগজ আর থাকিবে না—ইহা বরং আমার সহ্য হইবে, কিন্তু আপনি আর গ্রাহক থাকিবেন না, ইহা আমি সহিতে পারিব না। চট্টোরাজ মহাশয় তাহার রচিত আর একটি গল্প আমার কাছে রাখিয়া গিয়াছেন, এটিও যেন আমার কাগজে ছাপি ইহাই ছিল তাহার অন্তিম অনুরোধ। আমি তাহার অনুরোধ শুনিয়া ছলছল চোখে মৌন ছিলাম। আমার মৌনতাকে তিনি সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়াই তাহার গল্পটি ছাপা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া চোখ বুজিয়াছিলেন কি না, এবং ঐরূপ করিয়া থাকিলে গল্পটি আমার কাগজে ছাপিতে

ধর্ম্মত আমি বাধ্য আছি কি না জানি না; কিন্তু আপনি যেরূপ শাসাইয়াছেন, তাহাতে বাধ্য হইয়া আপনাকে কথা দিতেছি, আপনার জীবদ্দশায় গল্পটি আমি ছাপিব না। কিন্তু মরণান্তে আত্মার অস্তিত্বে যে আমি বিশ্বাস করি একথা আপনার জীবদ্দশায় আমাকে বাধ্য হইয়াই ভুলিয়া থাকিতে হইলেও আপনার পরলোকগমনান্তে নিরঙ্কুশ চট্টোরাজ মহাশয়ের আত্মার তৃপ্তির জন্য গল্পটি আমাকে ছাপিতেই হইবে।

এইবার সংক্ষেপে বলি "জীবন-সাহারা" গল্পটি কেন ছাপিলাম। গল্পটির লেখক নিরঙ্কুশ চট্টোরাজ ছিলেন আমার ছাপাখানার প্রধান কম্পোজিটার। ভদ্রলোক যৌবনে কম্পোজিটারী সুরু করিয়া নানা ছাপাখানা ঘুরিয়া প্রায় প্রৌঢ় বয়সে আমার ছাপাখানায় আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। অর্থাৎ আমিই তাহাকে অন্যত্র বিয়োগ দিয়া আমার এখানে যোগ দেওয়াইয়াছিলাম। গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না বলিয়া একটা প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু প্রবাদটির দুই গালে চুণকালি মাখাইয়া নিরঙ্কুশ পাথর মহাশয় এক ছাপাখানা হইতে অন্য ছাপাখানায় গড়াইয়া কপালে প্রচুর মূল্যবান অভিজ্ঞতার শ্যাওলা জুটাইয়াছিলেন, যাহা শেষকালে আমার ছাপাখানার প্রচুর উপকার করিয়াছিল। যাহারা নিরঙ্কুশবাবুকে দেখেন নাই তাহারা ধারণা করিতে পারিবেন না তিনি কি ছিলেন। আমার বিশ্বাস বিগত কয়েক জন্ম ধরিয়া তিনি ক্রমাগত কম্পোজিটারী করিয়া আসিতেছিলেন।

নতুবা মাত্র দুই এক জন্মের সাধনায় অমন আশ্চর্য্য সিদ্ধি কল্পনাও করা যায় না।

নিরঙ্কুশবাবু নিরতিশয় গম্ভীর ছিলেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কথা কহিতেন না, এবং ইসারায় সারিতে পারিলে আর আওয়াজ খরচ করিতেন না। কম্পোজিং ছাড়া তিনি আর কিছু জানিতেন বা জানা প্রয়োজন মনে করিতেন বলিয়াও মনে হইত না। ছাপাখানার মধ্যস্থতায় তাহার সহিত আমার সম্পর্ক নেহাৎ অল্পদিনের নয়, কিন্তু একদিনও আমার মনে হয় নাই যে তিনিও স্বামী হইতে পারেন, পিতা হওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে, জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ তাহার মনকেও দোলা দিতে পারে, আকাশের তারা মর্ত্যের ফুল তাহার জন্যও ফোটে, সিনেমা-থিয়েটার বা গানের জলসায়ও তাঁহাকে দেখা যাইতে পারে। অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে মাত্র একটি কথাই মনে হইত যে তিনি একজন পাকা কম্পোজিটার। অন্যরূপে তাহাকে কোনদিন কল্পনা করিবারই অবকাশ ঘটে নাই।

এহেন নিরঙ্কুশ বাবু যেদিন মুখ (এবং মন) খুলিলেন তখন স্বাভাবিক কারণেই অবাক হইলাম। ছাপাখানার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে ; অন্যান্য সবাই চলিয়া গিয়াছে, বসিয়া আছেন চুপচাপ একা একা নিরঙ্কুশবাবু। কহিলাম "সন্ধ্যা হয়ে এলো নিরঙ্কুশবাবু। বাড়ি ফিরবেন না ?" "বেলা যায়" শুনিয়া লালাবাবুর যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে, নিরঙ্কুশবাবুর বোধ করি অনেকটা সেই অবস্থাই হইল। তিনি

চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন "সন্ধ্যা হয়ে এলো? তাইতো। বাড়ি? হঁ্যা, তাও তো ফিরতে হবে।" যে ক্ষেত্রে মাথা নাড়িয়া ইসারাতে জবাব দেওয়া যাওয়া যাইতে পারিত সে ক্ষেত্রে তাঁহাকে একসঙ্গে এতগুলি কথা বলিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। পরে বুঝিয়াছি আমার আচমকা প্রশ্নে তাঁহার ভিতরকার সুপ্ত দার্শনিকটি জাগিয়া উঠার ফলেই তাঁহার মনের এবং মুখের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছিল।

একটা চেয়ার টানিয়া নিরঙ্কুশবাবুর পাশেই বসিলাম। নিরঙ্কুশবাবুও নিরঙ্কুশভাবেই কহিতে লাগিলেন, "সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, খেয়ালই করিনি অ্যাদ্দিন। রাত যখন হবে, তখন অন্ধকারে পথ চিনে বাড়ি যেতে পারবো কি? কে জানে? হয়তো পারবো। হয়তো পথকে আমার চেনা দরকার হবে না, পথই আমাকে চিনে নেবে।"

এ ধরণের দার্শনিক কথা আমার ভাল লাগিল না। বুঝিলাম ইঙ্গিতটি বড় সুবিধার নয়, ভদ্রলোক কাজ হইতে অবসর নিবার মতলব করিতেছেন। তাঁহার জায়গা কোনদিন খালি হইতে পারে এরূপ কল্পনাও কোনদিন আমার মনে স্থান পায় নাই। নিরঙ্কুশবাবু বিদায় নিলে তাঁহার মত নির্ভরযোগ্য পাকা কম্পোজিটার তো পাইবই না, পরন্তু এ বাজারে নিরঙ্কুশ বাবুকে যাহা দিই তাহার দ্বিগুণ দিয়াও একটা ভাল কম্পোজিটার পাওয়া যাইবে না। চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম "আপনার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি নিরঙ্কুশবাবু?"

নিরঙ্কুশবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন "যা ছিলো তার চাইতে আর কি খারাপ হবে? শরীরের একটা চক্ষুলজ্জা তো আছে? তবে মনটা একটু উদাস উদাস লাগছে বটে।"

সর্ব্বনাশ! ছাপাখানার প্রধান কম্পোজিটারের মন উদাস! চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করিলাম,—"বাড়িতে অসুখ নাকি কারো?"

নিরঙ্কুশবাবু কহিলেন, "বাড়িতে কেউ থাকলে তো অসুখ করবে। আমার বলতে দুনিয়ায় আমিই আছি সবেধন নীলমণি। ছিলো অবশ্য সবই এককালে—স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে। একে একে সব গেছে। আপনার এখানে যখন এলুম তখন আমি সর্ব্বহারা।" তাহার শেষের কথাটিতে শুনিতে পাইলাম তাহার ব্যথিত চিত্তের হাহাকার। সেই প্রথম জানিলাম পৃথিবীতে নিরঙ্কুশ চট্টোরাজ একা, সর্ব্বহারা। ভয় হইল তাহার এতদিনের চাপিয়া রাখা বৈরাগ্য এবারে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার ছাপাখানাকে না কানা করে। কেমন করিয়া ভদ্রলোকের মনের গতি বৈরাগ্য হইতে অন্যদিকে ঘুরাইয়া দিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মনের আবেগ ভাষা পাইলে মনটা অনেকটা হাল্‌কা হইয়া যাইবে এই আশায় নিরঙ্কুশ বাবুকে অনর্গল কথা কহিয়া যাইবার সুযোগ দিয়া নীরবে শুনিতে লাগিলাম।

নিরঙ্কুশবাবু কহিতে লাগিলেন "আজ সন্ধ্যাবেলায় ভাব্‌ছি জীবনটা কি করে কাটালুম। ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের মতো

শুধু পরের সম্পদ নেড়ে চেড়েই গেলুম। অন্যের লেখা টাইপে সাজিয়ে দিই, তাই থেকে কাগজে ছাপা হয়। লোকে পড়ে আর বাহবা দেয় লেখককে। কিন্তু যে লোকটা এত মেহনৎ করে কম্পোজ করে দিলো, যা না হলে ছাপাই হতো না, তার কথা ভাবলো না কেউ, তার নাম জানলো না কেউ। কত জাঁদরেল জাঁদরেল লেখককে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল এই নিরঙ্কুশ চট্টোরাজ, অথচ সে মরে গেলে কেউ মনে রাখবে না তার নাম। লক্ষ লক্ষ লোক মরে যেভাবে তলিয়ে যাচ্ছে, সেও যাবে সেভাবেই তলিয়ে।"

বুঝিলাম তাহার অন্তরের ব্যথা। এত লোককে বিখ্যাত করিয়া দিয়া তিনি নিজে অখ্যাত থাকিয়া যাইবেন এ কল্পনাটা তাঁহার অসহ্য লাগিতেছিল।

কহিলাম "তলিয়ে গেলেই হলো? আমি আপনাকে তলিয়ে যেতে দেবো কেন? ভগবান না করুন—আপনি যদি স্বর্গেই চলে যান, তাহলে, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এই ঘরে আপনার একখানা ছবি এনলার্জ করিয়ে আমি ঝুলিয়ে রাখবো। তার নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে আপনার নাম। এ ছাপাখানার আপনি যে কি ছিলেন এ যার মুখস্থ না থাকবে তার চাক্‌রী এখানে চলবে না। অর্থাৎ আমি যদ্দিন আছি তদ্দিন আপনি এখানে অমর থাকবেনই।"

কিন্তু ইহাতেও ভদ্রলোক খুশি হইলেন না। সম্ভবতঃ আমি চিরদিন থাকিব না একথা মনে ভাবিয়াই।

কহিলেন "বংশে বাতি দেবার কেউ রইল না যে আমি মরে গিয়েও তার মধ্যে বেঁচে থাক্‌বো।"

কম্পোজিটারের মুখে এরূপ ভাষা শুনিয়া আপনি হয়তো অবাক হইতেন, কিন্তু আমি হইলাম না। যে কম্পোজিটার জীবন ভরিয়া এত সাহিত্যিকের লেখা কম্পোজ করিল, তাঁহার পক্ষে বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনা হইতে ধার করিয়া এরূপ গদ্য-কবিতায় কথা বলা কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

বুঝিলাম নির্ব্বংশ হইয়া তিনি মরিতে চান না, অথবা মরিয়া নির্ব্বংশ হইতে চান না। মরিবার পূর্ব্বে এমন একজন প্রতিনিধিকে তিনি পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে চান যাহার মধ্যে তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। কহিলাম "কেউ থাকবে না কেন নিরঙ্কুশবাবু? থাকে যাতে সে ব্যবস্থা আমি করে দেবোখন। আপনার যে বয়স হয়েছে তাতে বংশধর লাভ করা এখনো অসম্ভব নয়।"

নিরঙ্কুশবাবু ম্লান হাসিয়া কহিলেন "দেহের বংশধর নয়—ওতো জানোয়ারেরও থাকে। আমি রেখে যেতে চাই মনের বংশধর। কিছু অবদান দিয়ে যেতে চাই সাহিত্যে, যারা আমার দেহটা ফুরিয়ে গেলেও আমার স্মৃতিকে অমর করে রাখবে।"

এইভাবে কথা সুরু করিয়া ধীরে ধীরে আমাকে সম্মোহিত করিয়া এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তিনি আমাকে শপথ করাইয়া নিলেন আমার মাসিকের আগামী সংখ্যায় তাঁহার রচিত একটি গল্প

থাকিবে। পরের সংখ্যাতেই তাঁহার রচিত এবং স্বহস্ত কম্পোজিত রচনা "জীবন সাহারা" বাহির হইল। গল্পটা না বাহির করিয়া উপায় ছিল না, কারণ—বিশ্বাস করুন—গল্পটি আমার অতুলনীয় মাসিকে বাহির না করিলে নিরঙ্কুশবাবু আমার ছাপাখানা হইতে বাহির হইয়া গিয়া আর ফিরিতেন না।

নিরঙ্কুশবাবুর এই প্রথম অবদানটির অর্থ আমি বুঝিতে না পারিলেও নিরঙ্কুশবাবুর কাছে বুঝিয়া নিতে চেষ্টা করি নাই। ভয় ছিল তিনি পাছে অর্থটি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়া আমাকে লজ্জা দেন অথবা বুঝাইতে না পারিয়া নিজে লজ্জা পান। পাঠক মহলে ও গল্পটি সম্বন্ধে কোনরকম উচ্চবাচ্য শুনি নাই, সম্ভবতঃ কেহই গল্পটির অর্থ বুঝিতে না পারার কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়া ফেলিতে রাজি নহেন। আপনি যে স্বীকার করিয়াছেন তাহা ঠিক আপনার উপযুক্তই হইয়াছে। কোন কোন পাঠক পাঠিকা জীবন-সাহারা গল্পটির খুব প্রশংসাও করিয়াছেন, সম্ভবত বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই। আমার তো মনে হয় পৃথিবীর অধিকাংশ প্রশংসাই এই জাতীয় না বুঝিয়া প্রশংসা।

প্রথম অবদানটি ছাপা হইবার পরই নিরঙ্কুশবাবু অসুখে পড়িলেন। মনে হইল যেন শুধু অবদানটি ছাপা হইবার জন্যই তিনি অপেক্ষা করিয়া ছিলেন।

অসুখ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। আমি

তাঁহাকে নিজের বাড়িতে রাখিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম। কিন্তু নিরঙ্কুশবাবু যখন বারবার কহিতে লাগিলেন ভগবানের ডাক আসিয়াছে তখন বুঝিলাম তাহাকে আর বাঁচানো যাইবে না। তবু মনে এই সান্ত্বনাটুকু পাইলাম যে, তাঁহার শেষ ইচ্ছাটা আমার মাসিকের পাতায় পূর্ণ হইয়াছে। আজকাল তো এমন লেখকের কিছু কমতি তাই যাহারা লেখক না হইয়া কম্পোজিটার হইলে সমাজের ও সাহিত্যের পক্ষে ভাল হইত। সে তুলনায় একজন পাকা কম্পোজিটার যদি লেখক হয় তাহাতে সমাজ ও সাহিত্যের এমন কি ক্ষতি ?

ইহার পর নিরঙ্কুশবাবু আর বেশীদিন টিকিলেন না। টিকিবার ইচ্ছাও আর তাহার ছিলো না, যদিও আমার একান্তই ইচ্ছা ছিল তাহাকে টিকাইবার। তাহার বিদায়ের লগ্ন যখন ঘনাইল তখন গোধূলি বেলা, পশ্চিম আকাশে নানারকমের নাম জানা এবং নাম না জানা রঙের খেলা চলিয়াছে, দখিনা হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে হাসনু-হানার মৃদু গন্ধ। এধারে দেয়ালের গায়ে একটা ক্যালেণ্ডার দুলিতেছে।

নিরঙ্কুশবাবুর অন্তিমবাণী যতদূর সম্ভব অপরিবর্ত্তিত এবং অকর্ত্তিতভাবে তুলিয়া দিতেছি।

"ঐ যে সূয্যি ডুবে যাচ্ছে, আমিও এবারে ডুববো। আমার জীবনের কাজ ফুরিয়ে গেছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে অনেক গুলো লেখক দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলাম এই দুটি হাতে ছোট গপ্পো লিখিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অকিঞ্চন ঘোষ-- এদের প্রত্যেকটি গপ্‌পোই এ কাগজে আমার কম্পোজ করা। জানিয়ে দেবেন এদের আমি চলে গেলে যে জীবন-সাহারার লেখক নিরঙ্কুশ চট্টোরাজই নিজে হাতে কম্পোজ করে করে তাদের সাহিত্য জগতে ঠেলে তুলে দিয়ে গেল। আর ঐ যে আপনার গায়ে উপন্যাস লিখিয়ে বৈকুণ্ঠ চম্পটি, লেখেন ভালো ভদ্রলোক। ভালো লেখেন, কিন্তু ওর হাতের লেখা আমি বলেই বুঝতে পেরেছি। এইবার একটু বেগ পেতে হবে। আর সৌভাগ্যশালিনী মিস্ত্রির, দিব্বি কবিতা লেখে মেয়েটি—আমারি হাতের তৈরী। এদের সকলকে আমার বিদায় জানাবেন, আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। এরা যেন আমি মরেছি বলেই থেমে না গিয়ে লেখে লেখে, আরো লেখে, আরো আরো লেখে।

আমার জীবনটা প্রায় সাহারার মতই কাটলো, তার ভেতরে এই কটি ফুল বাগান। ...বাঃ বাঃ, জানালাটা আরো খুলে দিন। দেখি আকাশে কত রং। কিন্তু একটা কথা বাকী রয়ে গেল। এই যে এই গল্পটা। আমার দুনম্বর অবদান, আমার শেষ অবদান—জীবন-সাহারার দ্বিতীয় খণ্ড, কম্পোজ করলে সাড়ে চার পৃষ্ঠার বেশী হবে না। ওটা—ওটা আমি চলে গেলে পর যেন ছাপা হয়। আমি ওপার থেকে দেখবো। কিন্তু বেচুকে যেন কম্পোজ করতে দেবেন না। ও ছোঁড়া মানুষ ভালো হলে কি হবে, কম্পোজিটার তত ভালো নয়। আমার শেষ অবদানটা কম্পোজ করতে দেবেন রামচাঁদকে, আর প্রুফটা যেন আপনিই

দেখে স্থান দয়া করে। আমার শেষ অবদানে যেন ছাপার ভুল না থাকে।

ছাপাখানার সবাইকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। প্রার্থনা করি ওরা সবাই দিনে দিনে আরো বেশী ভালো কাজ করে যেন ছাপাখানার সুনাম বাড়ায়। কিন্তু ঐ বেচুকে একটু দেখবেন। ওর প্রুফগুলোর ওপর একটু বেশী নজর দিতে হবে। মনে করুন সেই সেবারে শিশু-সাহিত্যিকের জায়গায় পশু সাহিত্যিক কম্পোজ করে কি কেলেঙ্কারীই না বাধিয়েছিল!

ধন্যবাদ আপনাকে দেওয়া মানেই দেবতাকে দেওয়া। অনেক ভাগ্যে আপনার মতো মনিব পেয়েছিলুম। মাইনে পেতে মাঝে মাঝে একটু আধটু দেরী হয়েছে বটে; কিন্তু ও তেমন ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

ভগবান? তাঁকে ডেকে আর কি হবে? তিনিই যে আমায় ডাকছেন। তাঁর ডাকে চেঁচিয়ে সাড়া দিতে হয় না, মনে মনে সাড়া দিয়েছি। যাই। এবারে যাই। কিন্তু...আমার জীবন সাহারা দ্বিতীয় খণ্ড... আমি মরে গেলে যেন ছাপা..." "হয়" বলার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণপক্ষী দেহ-পিঞ্জর পিছনে ফেলিয়া পলাইয়া গেল। "জীবন-সাহারা"-র দ্বিতীয় খণ্ড হাতে লইয়া কিছুক্ষণ আমি নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত নিরঙ্কুশ চট্টো-রাজের প্রাণহীন দেহের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। স্বর্গে ছাপাখানা আছে কি না জানি না; কিন্তু পৃথিবী একজন কম্পোজিটারের মত কম্পোজিটার হারাইল

সমস্তই আপনাকে খুলিয়া লিখিলাম। বিশ্বাস করুন; কিছুই আমার জ্ঞাতসারে গোপন করি নাই। শুধু নিরঙ্কুশবাবুর শেষ কথাগুলি তিনি যেরূপ হাঁফাইতে হাঁফাইতে থামিয়া থামিয়া টানিয়া টানিয়া বলিয়াছিলেন, লিখিবার বেলায় কাগজ বাঁচাইবার জন্যই সেরূপ টানিয়া টানিয়া না লিখিয়া একটানা লিখিয়া গিয়াছি। আমার একান্ত অনুরোধ আপনি আমার এই পত্রখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে—প্রয়োজন বোধ করিলে একাধিকবার—পাঠ করিয়া আপনার মতামত জানাইবেন। আপনাকে অকপটে যে সত্য বর্ণনা দিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া কোন পাষাণহৃদয়ও না গলিয়া থাকিতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

আপনার সহৃদয় জবাব যথাসময়ে পাইলে অনুগৃহীত বোধ করিব এবং আপনার মতামত জ্ঞাত হইয়া নিরঙ্কুশবাবুর "জীবন-সাহারা"-র দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য স্থির করিব। ইতি।

অচল সিকি

শ্রীপতিবাবু একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন।

"অ্যাঁ, বলিস কি রে! অচল? একেবারেই চলবে না?"

"না বাবু। দেখছেন না, একেবারে সীসে!"

অগত্যা পানওয়ালাকে একটি সচল তাম্রমুদ্রা দিয়া পানের খিলিগুলি এবং সেই মেকী সিকিটা পকেটে ফেলিয়া শ্রীপতি-বাবু পানের দোকান ত্যাগ করিলেন এবং তার আগে বলিয়া গেলেন, "দেখলি ত বাপু, ভালমানুষ পেলে সবাই ঠকায়। কে যে কখন আমার ওপর চালিয়ে দিলে টেরই পেলুম না। যাক, ভগবান আছেন।"

পানের দোকানটা কিছু দূর ছাড়াইয়া গিয়া পানের খিলি-গুলি রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া দুঃখিতভাবে শ্রীপতিবাবু কহিলেন, "এ পাইস হ্যাজ ডায়েড ইন দি ফীল্ড—একটা পয়সা একেবারে মাঠে মারা গেল। কিন্তু কি করব! পানগুলো ফেরত দিতে গেলে বেটা ঠিক বুঝত যে পান কেনাটা অচল সিকি চালাবার ফন্দী মাত্র। যাক, দেখি আর এক জায়গায়। ইফ য়্যাট ফার্ষ্ট ইউ ডোণ্ট সাকসীড,—তার পর কিনা?···একবারে না পার তো দেখ শতবার।"

বাস-ষ্ট্যাণ্ডে একটা বাস প্রায় ছাড়িতেছিল, আর তাহারই কাছে একটা পান-সিগারেটের দোকান। শ্রীপতিবাবু ভাবিলেন, "নাঃ, এবার আর পান নয়। এবার সিগারেট—যদিও আমার

কাছে দুই-ই সমান।” বলিয়া অত্যন্ত ত্রস্তভাবে দোকানীকে কহিলেন, “জলদি দে ত বাবা একটা কাঁচি সিগারেট।” দোকানী কাঁচি সিগারেট দিল বটে, কিন্তু সিকিটা নিতে কিছুতেই রাজী হইল না। অগত্যা শ্রীপতিবাবুর আরও কিছু লোকসান হইল, সিকিটা পকেটেই রইল, এবং বাসটা ছাড়িয়া গেল। শ্রীপতি-বাবুর মতলব ছিল এই যে, বাস ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ির ভাব দেখাইলে দোকানী তাড়াতাড়িতে হয়ত সিকিটাকে মেকী বলিয়া নাও চিনিতে পারে। কিন্তু দোকানী ঝানু লোক, —পান-সিগারেটওয়ালারা সাধারণতঃ ঝানুই হইয়া থাকে—তাহাকে ঠকান অত সহজ নয়। লোকটা হয়ত শ্রীপতিবাবুর মতলব বুঝিতে পারিয়াছিল। সে শ্রীপতিবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া মুখে কিছু না বলিলেও এমন বিশ্রীরকম হাসিল যে শ্রীপতি বাবুর—শ্রীপতিবাবুরও পর্য্যন্ত!—বিশ্রীরকম লজ্জা লাগিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলেন কি উপায়ে অচল সিকিটাকে চালান যায়। ইতিমধ্যে ত প্রায় এক আনা খরচ হইয়া গেল। নাঃ, এ উপায়ে আর চলিবে না। এ ভাবে পয়সা বাজে খরচ হইতে থাকিলে শেষকালে যদি সিকিটা চালানও যায় তবুও বিশেষ লাভ থাকিবে না।

এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে শ্রীপতিবাবুকে ভালমানুষ পাইয়া কেহ তাঁহার কাছে সিকিটি চালাইয়া দিয়াছে—একথা কেহ মনে করিয়া থাকিলে অত্যন্ত ভুল করিয়াছেন। শ্রীপতি-[illegible] কেহ অচল কিছু চালাইবে! এই অচল সিকিটি তিনি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন।

একদিন এক ভদ্রলোক একটা সিকি কোন জায়গায় চালাইতে না পারিয়া অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং 'ধেৎ তেরি' বলিয়া সিকিটি রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সুযোগমত শ্রীপতিবাবু সেই সিকিটি কুড়াইয়া লইয়াছিলেন। সেই সিকিটাই এই সিকি যাহার গল্প বলিতে সুরু করিয়াছি।

চলিতে চলিতে পথে পুরাতন বন্ধু গজানন বাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। বহু দিন আগে এই গজাননের সঙ্গেই শ্রীপতিবাবু বার বার তিনবার ফোর্থ ক্লাসে ফেল করিয়াছেন, এবং তাহার পর পড়া ছাড়িয়াছেন। পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া শ্রীপতিবাবু ভয়ানক খুশী হইয়া গেলেন এবং বন্ধুর পকেটে দু-একবার ঝনঝন আওয়াজ শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

পুলকে আকুল হইয়া শ্রীপতিবাবু কহিলেন, "আরে গজু যে! বহুদিন বাদে দেখা হ'ল। কেমন আছ ভাই? কি করছ এখন?"

"আছি কোন রকমে ভাই। দালালী করি।"

"দালালী! ওতে বেশ দু-পয়সা হচ্ছে?"

"দু-পয়সা কেন! তার বেশীই হচ্ছে। আজকাল চাকরির বাজার জান তো? এ রকম ইনডিপেনডেণ্ট ব্যবসায়ে না ঢুকতে পারলে আজকাল আর সুবিধে নেই। এই তো ধর না আমার বড় শালার ছোট ছেলে এম-এ পাস ক'রে চাকরির জন্যে ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে বছরখানেক হ'ল। কোথাও কিছু সুবিধে ক'রে উঠতে পারলে না। শুনতো যদি আমার কথা তো হয়ে যেত একটা হিল্লে! তা, ভাল কথা তো শুনবে

না !···তুমি এখন কি করছ ভাই ?”

“চিকিচ্ছে করি, রোগ সারাই। আমার হতাশ-চিকিৎসালয়ের নাম শোন নি ?”

“কই না তো ! হ্যাঁ, মাঝে মাঝে বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখি বটে। সেই যে ‘গ্যারাণ্টি দিয়া হতাশ রোগীদিগকে আরোগ্য করি। পত্রাদি গোপনে রাখা হয়।’ সেই তো ?”

“হ্যাঁ ভাই, ঠিক ধরেছ।”

“এতে কেমন আয় হচ্ছে ?”

“চলে তো যাচ্ছে দিব্বি ভগবানের কৃপায়।” বলিয়া শ্রীপতিবাবু পরম কৃপাময় ভগবানকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন

“কিন্তু তুমি আবার ডাক্তারী পাস করলে কবে হে ?” অবাক হইয়া গজানন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “না কি কোনো কবরেজের য়্যাসিষ্টাণ্ট থেকে—”

“আরে ছোঃ !” শ্রীপতিবাবু বলিলেন, “ও সব কিছু না। আমার ওষুধগুলো কতক স্বপ্নাদ্য, কতক পেটেণ্ট, কতক মহাপুরুষ প্রদত্ত। তা যাক্ গে—তোমার স্ত্রী কেমন আছেন ?”

“থাকাথাকির বাইরে চলে গেছে।” গজাননবাবু বলিলেন। “কিন্তু কি দরকার তার কথা তুলে ?”

শ্রীপতিবাবু গজাননবাবুর সহধর্ম্মিণীকে কোনদিন দেখেন নাই। তবু গজাননবাবুকে খুশী করিবার জন্য তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া গেলেন। চোখে জল

আনিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিলেন "আহা হা, বড় সতীলক্ষ্মী ছিলেন। অমন ভাল মানুষ আর হয় না। তোমার···"

চটিয়া গিয়া গজাননবাবু কহিলেন, "ভাল? তুমি কি ক'রে জানলে ভাল? দেখলে না শুনলে না কোন দিন।"

একটু থমকিয়া শ্রীপতিবাবু কহিলেন, "লোকের মুখে শুনে জানি আর কি। সবাই বলে ভাল, তাই—"

"সবাই? কারা বলেছে ভাল ব'ল তো?" এইবার গজাননবাবু ক্ষেপিয়া উঠিলেন। "নাম কর তো তাদের। আর তাদের ঠিকানাগুলো দাও তো। সব শালাকে এই বক্সিং-করা হাতের গাঁট্টা কাকে বলে বুঝিয়ে দিয়ে আসি।···ভাল? ভাল না হাতী। যদ্দিন বেঁচে ছিল জ্বালিয়ে মেরেছে! মরেছে, না আমার হাড়ে বাতাস লেগেছে।"

"আহা হা, অত গরম হও কেন ভাই?" শ্রীপতিবাবু বলিলেন। "যে মানুষ ম'রে গেছে তার নিন্দে করতে নেই। ঐ যে কথায় বলে, হোয়েন দি ম্যান ইজ ডেড···" শ্রীপতিবাবু ইংরেজী কথাটা অসমাপ্ত রাখিলেন, কেন-না অসমাপ্ত কথার জোর বেশী হয়। মনে মনে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তাঁহার প্রথম অস্ত্রটিতে কোন কাজ হইল না, বরং হিতে বিপরীত হইল। পরলোকগতা স্ত্রীকে প্রশংসা করিয়া গজাননবাবুকে অত্যন্ত খুশী করিয়া পরে আস্তে আস্তে তাহার মন নরম করিয়া আনিবেন এবং সময় বুঝিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিবেন, এই ছিল শ্রীপতিবাবুর মতলব। কিন্তু···

"যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি" শ্রীপতিবাবু ভাবিলেন, এবং বলিলেন, "যাক ভাই, অতীতের কথা তুলে আর লাভ নেই। কিন্তু···হ্যাঁ, অ্যাদ্দিন পরে তোমায় দেখে কি আনন্দই লাভ করলুম ভাই, সে আর বলবার কথা নয়। অতীতের কত কান্না, কত হাসি—কত কি যে মনে পড়ে যাচ্ছে!···" বলিতে বলিতে, এবং তাহারই সঙ্গে চলিতে চলিতে, শ্রীপতিবাবুর চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িল।

তার পর—"সেই স্কুল পালানো, নৌকো বাইচ, মাষ্টার মশায়ের কানমলা, সেই বটগাছ—সব যেন চোখের সামনে ভাসছে। আমার কি মনে হয় জান ভাই গজু?—যেদিন চলে যায় সেদিন আর ফিরে আসে না।···"

তত ক্ষণে দু-জনে একটা অন্ধকার গলির মোড়ে আসিয়া পড়িয়াছেন। শ্রীপতিবাবু দেখিলেন এইখানেই সুবিধা। কাজ হাসিল হইবামাত্র ঝাঁ করিয়া গলির ভিতর ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবেন কোনও অজুহাতে। এবং অজুহাতের জন্য শ্রীপতিবাবুকে কোনদিনই বিশেষ ভাবিতে হইত না—এ-বিষয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত—অর্থাৎ সিদ্ধমুখ ছিলেন।

সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িয়া হঠাৎ কি যেন ভাবিয়া শ্রীপতিবাবু কহিলেন, "হ্যাঁ ভাই গজু, তোমার কাছে একটা সিকির চেঞ্জ হবে?" কারণ ইতিপূর্ব্বে গজুবাবুর পকেটের আওয়াজ শুনিয়াই বুঝিয়াছিলেন তাহার পকেটে যথেষ্ট চেঞ্জ আছে এবং সিকির চেঞ্জ থাকার খুবই সম্ভাবনা। দেখা গেল

শ্রীপতিবাবুর ওস্তাদ কান তাঁহাকে ভুল আন্দাজ দেয় নাই। গজাননবাবু বলিলেন, "তা হবে।" বলিয়া চারিটি আনি বাহির করিলেন। শ্রীপতিবাবু তাড়াতাড়ি আনি চারিটি পাইয়া গজানন বাবুর হাতে সিকিটি দিয়া "তাহ'লে আসি ভাই, আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই" বলিয়া সাঁ করিয়া গলির ভিতর অদৃশ্য হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু গজাননবাবু দালাল মানুষ, মানুষ চরাইয়া খান। ঝানু তিনি পানওয়ালাদের চাইতে কম নহেন। সিকিটা হাতে পাইয়াই কহিলেন, "দাঁড়াও হে শ্রীপু, এ কি সিকি দিয়েছ! এ যে একেবারেই তোমার গিয়ে সীসে।"

শ্রীপতিবাবু আর একবার আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন, "অ্যাঁ, বল কি? সীসে? নাঃ, ভালমানুষ পেলে দেখছি সবাই ঠকায়। দুনিয়ায় দেখছি কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।"

গজাননবাবুকে তাঁহার চারিটি আনি ফেরত দিতে হইল। গজাননবাবুও সেই পানওয়ালাটার মত এমন বিশ্রী রকম হাসিলেন যে এই অনেক দিনের পরে দেখা বন্ধুটির কাছে শ্রীপতিবাবুর অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল। সীতা দেবীর মত ধরণীকে দ্বিধা করিয়া পাতালে প্রবেশ করিতে তাঁহার একবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে না বুঝিয়া পাশের গলিতে প্রবেশ করাই তিনি ঠিক করিলেন, এবং যাহা করা ঠিক করিলেন তাহা করিতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। "এখানে আমার একটু বিশেষ কাজ আছে" বলিয়া তিনি

গলিতে ঢুকিয়া পড়িলেন, এবং গজাননবাবু আপনার কাজে চলিয়া গেলেন।

"উঃ! গজুটা কি চামার হয়ে উঠেছে আজকাল!" অত্যন্ত দুঃখের সহিত ভাবিতে লাগিলেন শ্রীপতিবাবু। "আমি সিকিটা দিলুম সেটা বিশ্বাস ক'রে নিতে পারল না, বাজিয়ে দেখল! ওঃ! বন্ধু পর্য্যন্ত আজকাল বন্ধুকে বিশ্বাস করতে পারে না!" যে পৃথিবীতে বন্ধু পর্য্যন্ত বন্ধুকে বিশ্বাস করিতে পারে না, সে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিয়া কোন লাভ আছে কিনা, ইহাই চিন্তা করিতে করিতে এবং পৃথিবীটা যে কি ভয়ানক খারাপ হইয়া উঠিতেছে তাহা ভাবিয়া শ্রীপতিবাবুর দুটি চোখ সজল হইয়া উঠিল—সারাটা হৃদয় ব্যথায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

বলা বাহুল্য, গলিটির ভিতর শ্রীপতিবাবুর বিশেষ বা অবিশেষ কোন রকম কাজই ছিল না। কাজেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন চামার গজানন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে তখন গলি হইতে বাহির হইয়া আবার বড় রাস্তায় চলা সুরু করিলেন এবং চলার সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে লাগিলেন, "এবারে কি করা যায়!"

খানিকটা অগ্রসর হইতেই দেখা হইল মণ্টু বাবুর সঙ্গে। শ্রীপতিবাবু ভারী খুশী হইয়া গেলেন, কেন-না মণ্টু বাবু অসাধারণ ভালমানুষ। তাঁহাকে পরম হংসও বলা যাইতে পারে; হাঁস যেমন দুধ এবং জলের মিশ্রণ হইতে দুধটুকুই গ্রহণ করে, মণ্টু বাবুও সেইরূপ লোকের দোষ ছাড়িয়া কেবল গুণটুকু গ্রহণ করিতেন। মানুষ যে খারাপ হইতে পারে ইহা তাঁহার

ধারণার অতীত, তাঁহার ধারণা এই যে মানুষমাত্রেই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। ঘোর সত্যযুগের মাঝখানে ঘুমাইতে সুরু করিয়া ঘোর কলিযুগের মাঝখানে যেন মণ্টু বাবু সবেমাত্র তাঁহার রিপভ্যান উইঙ্কলকে হারমানানো ঘুম হইতে জাগিয়াছেন। মণ্টু বাবুর কাছে হয়ত সিকির চেঞ্জ আছে, এবং যদি থাকে তাহা হইলে অচল সিকিটা তাহার ঘাড়ে অনায়াসেই চাপানো যাইবে, একথা মনে করিয়া শ্রীপতিবাবুর মন এমন একটা অবর্ণনীয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল যে গান গাহিবার প্রবল ইচ্ছা চাপিয়া রাখিতে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল!

কিন্তু একটু গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা না করিয়াই ফস করিয়া সিকির চেঞ্জ চাওয়াটা ঠিক ভাল মনে হইল না। কাজেই একথা-সেকথা বলিতে বলিতে কিছু দূর তিনি চলিলেন মণ্টু বাবুর সঙ্গে। আর একটা গলির সম্মুখে আসিয়া শ্রীপতি বাবু বলিলেন, "ভাল কথা, মণ্টু বাবু সিকির ভাঙানি হবে আপনার কাছে?"

মণ্টু বাবু একটু আগেই কোন একটি মহৎ ব্যক্তির নিকট হইতে একটা সিকি ভাঙাইয়া লইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ আছে। দুটো দুয়ানি।"

"তাই দিন" বলিয়া অচল সিকিটা মণ্টু বাবুকে দিয়া দুয়ানি দুটি নিয়া শ্রীপতিবাবু তীরবেগে গলির ভিতর ঢুকিয়া গেলেন; তার পর দুয়ানি দুটির দিকে ভাল করিয়া নজর করিয়া তিনি হায় হায় করিয়া উঠিলেন। এ কি সর্ব্বনাশ! দুটিরই চেহারা

উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবকের চেহারার মত ম্লান—এমনি শোচনীয় চেহারা যে দেখিলে অতি কঠিন চোখেও অশ্রু আসে।

তত ক্ষণে মণ্টুবাবু অনেকটা পথ চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীপতিবাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন।

এ দুটি দুয়ানির চাইতে সেই সিকিটাই ছিল বরং ভাল। সিকিটা আসলে অপদার্থ হইলেও তাহার চেহারায় একটু জলুষ ছিল। এ দুটি দুয়ানির যে তাহাও নাই।

কিছুক্ষণ ছুটিয়া মণ্টুবাবুকে পাইয়া শ্রীপতিবাবু যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া মণ্টুবাবু অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল, শ্রীপতিবাবু ?"

"হবে আর কি ? আমার ভাঙানির দরকার নেই মশাই। আমার সিকি আমায় দিন, আপনার দুয়ানি দুটো আপনি নিন। আবার যেমন ছিল তেমনি হোক।"

অবিলম্বে যেমন ছিল তেমনি হইল। শ্রীপতিবাবু জানিতেন মণ্টুবাবু সিকিটিকে নিশ্চয়ই পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। তিনি কহিলেন, "দুয়ানি দুটো আপনাকে স্রেফ ঠকিয়ে দিয়েছে। একেবারে অচল।"

"অচল ? বলেন কি ? তাই নাকি ?" মণ্টুবাবু অবাক হইয়া কহিলেন। "তাহ'লে লোকটা নিশ্চয় ভুল ক'রে দিয়েছে।"

ভুল করিয়া যে এই দুটি অচল দুয়ানি দিয়াছে সে এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া হয়ত কত আফশোষ করিতেছে

এ কথা ভাবিয়া মণ্টুবাবুর চোখ দুটি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। তিনি সজল ছল-ছল চোখ দুটি রুমালে মুছিয়া ফেলিলেন।...

"নাঃ, এ আর চালান যাবে না" হতাশ ভাবে বলিতে বলিতে শ্রীপতিবাবু অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু মুখে এ কথা বলিলেও মন এ কথায় সায় দিল না। অসম্ভবকে সম্ভব করিবার অর্থাৎ অচলকে সচল করিবার উপায় ভাবিতে লাগিলেন।

"সুরেন বাঁড়ুয্যে সেট্‌ল্‌ড্ ফ্যাক্ট আনসেট্‌ল্‌ড্ করেছিল।" শ্রীপতিবাবু ভাবতে লাগলেন, "আর আমি একটা অচল সিকি চালাতে পারব না? দেখা যাক; ঐ যে একটা হিন্দী কথা আছে না—হাল ছোড়েগা নেহি।"

হাল তিনি ছাড়ুন বা নাই ছাড়ুন, ফুটপাথের উপর একটা কলার ছোবড়া পড়িয়া ছিল—সেটি তাহাকে ছাড়িল না, এবং এই না-ছাড়ার ফলে এক অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শ্রীপতিবাবু দেখিলেন তিনি চীৎ হইয়া ফুটপাথের উপর শুইয়া আছেন, প্রায় সমস্ত শরীরেই একটু অদ্ভুত রকমের ব্যথা অনুভব করিতেছেন, এবং তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কয়েক জন বাঙালী ভদ্রলোক সমবেত ভাবে প্রমাণ করিতেছেন যে বাঙালী হাসিতে জানে না, এ কথাটা একেবারে মিথ্যা। এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আসিয়া শ্রীপতিবাবুকে ধরিয়া তুলিলেন। শ্রীপতিবাবুর সারা গায়ে, বিশেষতঃ মাথায় ও পায়ে, ব্যথা বোধ হইতেছিল। তিনি বুঝিলেন হাঁটিয়া বাড়ী ফেরা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

অগত্যা একটা বাসেই উঠিতে হইল। বাসওয়ালার বরাতে ছিল ক'টা পয়সা—বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে ?

শ্রীপতিবাবু একবার মনে করিলেন বাসের টিকিট কেনার সময় অচল সিকিটা চালাইয়া দিবেন। কিন্তু পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টরকে দেখিয়া বিশেষ ভরসা পাইলেন না। শেষকালে যদি ধরা পড়েন, তাহা হইলে হয়ত ছু-চারিটা গালি শুনিতে হইবে—গাঁট্টাও খাইতে হইতে পারে। সুতরাং ভয়ে ভয়ে তিনি সাধু হইলেন, অর্থাৎ সচল পয়সা দিয়াই বাসের টিকিট কিনিলেন।

তখন বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে। কোন এক মিশনের জনৈক গেরুয়াধারী সেবক বাসে উঠিলেন দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলিতে। তাঁহার হাতে একটি তালা-বন্ধ-করা কাঠের বাক্স, যাহার মাথায় একটি সরু ছিদ্র আছে পয়সা গলাইবার জন্য। বাসে গান গাওয়া অসুবিধা, তাহা না হইলে সেবকটি হয়ত "ভিক্ষা দও গো" ইত্যাদি বুক-কাঁপানো সুরে গাহিতে সুরু করিতেন। বাসের অভ্যন্তর এবং রাজপথ—এ দুয়ে অনেক তফাৎ। সুতরাং গেরুয়াধারী সেবক ভদ্রলোক গম্ভীর কণ্ঠে দুর্ভিক্ষের ভীষণতা বর্ণনা করিয়া বাঙালীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাঙালী জাত বক্তৃতা শুনিতে এত অভ্যস্ত যে বক্তৃতা জিনিষটা বাঙালীর মনে বিশেষ কাজ করে না। কাজেই সেবকটির বক্তৃতা প্রথম কয়েক মিনিট ধরিয়া অরণ্যে রোদন অপেক্ষাও অনর্থক হইল, কেন-না অরণ্যে রোদন করিলে বাঘ সিংহ হয়ত

সাড়া দেয়, কিন্তু সেবকটির এই বাসে রোদনে বাসের কেহ সাড়া দিল না। বাক্স খালিই রহিল।

কিন্তু ভীষণ দুর্ভিক্ষের ভীষণতর বর্ণনা শুনিয়া শ্রীপতিবাবুর কোমল পরদুঃখকাতর হৃদয় আর ঠিক থাকিতে পারিল না। শ্রীপতিবাবু চোখে রুমাল চাপা দিয়া বালকের মত কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন, "বলেন কি মশায়? এমন শোচনীয় অবস্থা? অনাহারে শুকিয়ে মরছে মানুষ সেখানে? ছেলের মুখের গ্রাস মা কেড়ে নিচ্ছে? উঃ, থামুন্ মশায়—আর যে সইতে পারিনে।" শ্রীপতিবাবু উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার এই কান্নায় সেবকটি অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন। তিনি কোন দিকে কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া অগত্যা সেবকজীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন—সে অনেক দিনের কথা। এই দীর্ঘ সেবকজীবনে এরূপ সাফল্যের আনন্দময় অভিজ্ঞতা তিনি আর কখনও লাভ করেন নাই। আনন্দে তাঁহারও দুটি চোখ সজল হইয়া উঠিল। তিনি দুর্ভিক্ষের অসহ্য কাহিনী আরও অসহ্য করিয়া তুলিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে বক্তৃতা সুরু করিলেন।

"ওঃ! এত কষ্টও ভগবান দেন মানুষকে!" কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে শ্রীপতিবাবু বলিতে লাগিলেন, "আমাদেরই বাংলা দেশের লোক দারুণ দুর্ভিক্ষে হাহাকার ক'রে কাঁদছে, আর আমরা কিনা দিব্বি—ওঃ!' শ্রীপতিবাবু আবার কাঁদিয়া বেসামাল হইয়া পড়িলেন। দেশবাসীর দুঃখে শ্রীপতিবাবুর এরূপ অসাধারণ সমবেদনা দেখিয়া বাসের সকলেই নিজেদের ঔদাসীন্যের কথা

ভাবিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ কাঁদিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু "চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাই" এ কথাটা অনেকে বলিলেও কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। চেষ্টা করিলেই সবাই কাঁদিয়া ভাসাইতে পারে না।

অনেক কষ্টে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া শ্রীপতিবাবু কহিলেন, "বাংলার ভাইদের, মা-বোনদের এত দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী শুনেও যারা এ বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারে ধিক্ তাদের জীবনে।"...বলিয়া পকেট হইতে সেই সিকিটা বাহির করিলেন।

"সঙ্গে তো বিশেষ কিছু নেই। বাসভাড়া দিয়ে মাত্তোর এই সিকিটা আছে। তাই দিই এখন।" বলিয়াই যেন সবাই সিকিটা দেখিতে পায় এইভাবে, ঝট্ করিয়া বাক্সের ভিতর গলাইয়া দিলেন। একটা পয়সা নয়, দুটা পয়সা নয়—একেবারে একটা সিকি! এই অপূর্ব্ব বদান্যতা দেখিয়া বাসের সবাই, এবং বাক্সওয়ালা গেরুয়াবিলাসী সেবক ভদ্রলোকটি অবাক হইয়া গেলেন। পরে যখন 'সেই জীবনে ধিক্' কথাটার একবার পুনরাবৃত্তি করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া চোখে রুমাল চাপিয়া শ্রীপতিবাবু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিলেন, তখন আত্মসম্মান রক্ষার জন্য এবং ধিক্কারের হাত হইতে জীবন বাঁচাইবারজন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সিকি, আধুলি, দুয়ানি ইত্যাদিতে বাক্সটি দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠিল।...

বাস হইতে নামিয়া বাড়ীর দিকে চলিতে চলিতে শ্রীপতি বাবু ভাবিলেন, "যাক্—অচল সিকিটা শেষ পর্য্যন্ত একটা মহৎ কাজে লাগল।"

প্রেম-ত্রিকোণ

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন "পৃথিবীর লোকগুলি যদি সকলে মিলিয়া স্বার্থ ত্যাগ করিয়া আত্মত্যাগ শিখিত তাহা হইলে পৃথিবীটা এরূপ দুঃখের আগার হইত না। এত রক্তপাত, মুণ্ড-পাত ইত্যাদি বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত হইত না। এই যে এত রাজনীতির ব্যঞ্জনা, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা—এ সমস্তের মূলেই মানুষের দুরারোগ্য স্বার্থবোধ ও স্বার্থপরতা। যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা অপর জাতিকে নিগ্রহ করিতে প্রত্যেক জাতিরই ঐকান্তিক আগ্রহ কেন? কারণ প্রত্যেক জাতিই স্বীয় স্বীয় স্বার্থ চর্চ্চায় নিরতিশয় ব্যস্ত। পৃথিবীর সর্ব্ব লোক যদি আত্মত্যাগ ব্রতে দীক্ষিত হইত, তাহা হইলে রণকোলাহল ও অশান্তির হলাহলে পৃথিবী মুখরিত হইত না। তাহা হইলে পাটলীপুত্রকে পৃথিবীর রাজধানী করিয়া আমি—"

চাণক্য এতক্ষণ নীরবে চন্দ্রগুপ্তের বাক্য স্রোত শ্রবণ করিতে করিতে দেখিতেছিলেন প্রিয় শিষ্যের শিশুসুলভ বুদ্ধির দৌড় কতখানি। কিন্তু এইবার আর নৈরব্য তাহার পক্ষে সম্ভব

হইল না। চাণক্যোচিত হাস্য করিয়া তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজকীয় পৃষ্ঠে সাদরে চপেটাঘাত পূর্ব্বক কহিলেন :

"বৎস, তোমার নাবালক-সুলভবুদ্ধি যে কবে সাবালক-সুলভ হইবে তাহা বলা ব্রহ্মাণ্ডে কাহারও সাধ্যায়ত্ত কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শ্রবণ কর। এককালে আমিও নাবালক ছিলাম এবং তুমি এক্ষণে যেরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতেছ, প্রায় অবিকল সেরূপ মনোভাব আমারও ছিল। কিন্তু ক্রমে অভিজ্ঞতার বাতাসে তাহা ধূলার মত উড়িয়া গিয়াছে।

তুমি মনে করিতেছ আত্মত্যাগ যদি পৃথিবীর সকলে ব্রত রূপে গ্রহণ করিত তাহা হইলে পৃথিবী বড়ই সুখের আলয় হইত। তোমার কল্পনাটি কব্যুচিত বটে ; ইহার সহিত বাস্তবের কোন সম্বন্ধ নাই। আমার স্রোতস্বিনীতে অবগাহনের সময় হইয়া আসিতেছে, সুতরাং বিষয়টা তোমাকে পরিপূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার সময় নাই। তবে সংক্ষেপে একটা গল্প বলি শুন।

প্রাচীনকালে বিদিশা নগরীতে খালিত নামে এক ভদ্রলোক বাস করিতেন। চিকীর্ষা নামে তাঁহার এক সুন্দরী কুমারী কন্যা ছিল। কন্যাটী রূপে, গুণে, বয়সে অতুলনীয়া—অর্থাৎ গল্প জমাইবার মত সব কিছুই তাহার ছিল। বর্ণনাটী হয় তো অতি সংক্ষিপ্ত হওয়াতে তোমার মনঃপূত হইল না, কিন্তু অর্থশাস্ত্র রচনা করিতে যাহার দক্ষিণ করে কড়া পড়িয়া গিয়াছে তাহার

নিকট হইতে ইহাপেক্ষা অধিক আশা করা মূর্খতা মাত্র।

খালিতের বাড়ীর অতি নিকটেই কিরীচ ও গাণ্ডীব নামে তুইটি তরুণ বাস করিত। তাহাদের একজনের চেহারা কন্দর্পের মত, অন্য জনের চেহারা কার্ত্তিকের মত। তুজন একই সময় রাজপথে বাহির হইলে পথিকগণ মহা সমস্যায় পড়িয়া যাইত—কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে দেখিবে। নদীতীরে নিরজনে গোপনে ধনুর্ব্বিদ্যা ও সঙ্গীত বিদ্যা অভ্যাস করিয়া তুজনেই সুপক্ক ধানুকী ও সঙ্গীতবিশারদ হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে এমন হইল যে, ইহারা ধনুক ধারণ করিলেই জলচর, স্থলচর ও খেচরগণ ত্রস্ত হইয়া উঠিত, এবং ইহাদের কেহ সঙ্গীতের আসরে আত্মপ্রদর্শন করিলেই বৃহৎ বৃহৎ ওস্তাদগণ পর্য্যন্ত তম্বুরাদি ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন। সাহিত্য সাধনা তু'জনেই করিত—কিরীচ লিখিত কবিতা ও কাব্য, গাণ্ডীব লিখিত গল্প ও উপন্যাস। কিন্তু মজা ছিল এই যে, তাহাদের সাহিত্যিক প্রদেশ বিভিন্ন হইলেও তাহাদের রচনার জনপ্রিয়তা-গত কোন বৈভিন্ন্য ছিল না। কারণ কিরীচ তাহার কবিতায় ও কাব্যে অতি অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত গল্প ও উপন্যাসের মাধুর্য্যের সন্নিবেশ করিত এবং গাণ্ডীব ও অতি আশ্চর্য্য উপায়ে তাহার গল্প ও উপন্যাসে কবিতা ও কাব্যের রস সিঞ্চন করিত। সুতরাং কবিতা ও কাব্য এবং গল্প ও উপন্যাস যেরূপ পারস্পরিক ভাবে অভাবপূরক, কিরীচ ও গাণ্ডীবের রচনা সেরূপ ছিল না।

তাহারা ছিল স্বতঃসম্পূর্ণ। কাহার লেখাকে অগ্রে স্থান দিবেন এই চিন্তায় সম্পাদকগণ অস্থির হইয়া উঠিতেন এবং কাহার লেখা অগ্রে পড়িবেন এ সমস্যার সমাধান পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষে খুব সহজ ছিল না।

আমি বলিয়া না দিলেও তোমার বুঝিতে পারা উচিত যে, চিকীর্ষা, কিরীচ ও গাণ্ডীব—এই তিন বিন্দু পারস্পরিক সহযোগে একটি প্রেম-ত্রিকোণ সৃষ্টি করিল। কিরূপে, বলি বলি শুন।

উদ্দালক নামে জনৈক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র অতি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্র অধ্যাপনার্থে একটী বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। প্রথম প্রথম যথেষ্ট ছাত্র জুটিয়াছিল এবং ছাত্রদের মধ্যে ছিল আমাদের গল্পের কিরীচ ও গাণ্ডীব। কিন্তু পণ্ডিত উদ্দালক সর্ব্বপ্রকার জটিল শাস্ত্র এরূপ সরল করিয়া ফেলিতেন যে, ছাত্রেরা ক্রমেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা হারাইয়া ফেলিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, তিনি শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিতেছেন। ধীরে ধীরে তাহার বিদ্যালয় হইতে ছাত্রগণ বিদায় নিতে লাগিল।

কিরীচ ও গাণ্ডীব আসিয়া খালিতের ছাত্রত্ব গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহার কারণ খালিতের বিদ্যাবত্তা না চিকীর্ষা-পিতৃত্ব তাহা সঠিক বলিবার চেষ্টা নাই করিলাম।

খালিতের অন্য ছাত্র ছিল না—তিনি দুটী ছাত্র পাইয়া পরম যত্নের সহিত তাহাদিগকে পড়াইতে লাগিলেন।

তাঁহার কিছু জমিজমা ছিল—আহার ও বসনের কোন চিন্তা ছিল না। সুতরাং এতদিন তিনি উল্লেখযোগ্য কোন কর্ম্মই করেন নাই। উদরের তাড়না না থাকিলে সংসারে ক'জন উল্লেখযোগ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে?

পিতাকে অধ্যাপনা করিতে দেখিয়া চিকীর্ষা অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করিত। কিরীচ ও গাণ্ডীব যখন খালিতের নিকট পাঠ গ্রহণ করিত, তখন চিকীর্ষা অদূরে বসিয়া পিতার কাণ্ড দর্শন করিতে করিতে মৃদু মৃদু হাস্য করিত। তখনও মুকুরের প্রচলন হয় নাই, সুতরাং আধুনিকা সুন্দরীগণ স্বীয় স্বীয় মৃদু হাস্যের মোহিনীশক্তি সম্বন্ধে যতটা সচেতন, খালিত-তনয়া চিকীর্ষা ঠিক ততটাই অচেতন ছিল। তাই তাহার মৃদু মৃদু হাস্য যে পরম দ্রুতবেগে কিরীচ ও গাণ্ডীবের তরুণ চিত্তে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু কিরীচ ও গাণ্ডীব যে ক্রমশঃই তাহার তরুণী চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা সে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে না পারিলেও অস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল।

খালিত ভদ্রলোক নেহাৎ সরল-বুদ্ধি,—একমাত্র সহধর্ম্মিণীকে হারাইয়াও তাঁহার সারল্য কিছুমাত্র কমে নাই। তাঁহার মধ্যস্থতায় যে একটি প্রেম-ত্রিকোণ খাড়া হইতেছে, তাহা বিন্দুমাত্রও বুঝিতে না পারিয়া তিনি মহানন্দে ছাত্র দুটীকে পাঠ দিতে লাগিলেন।

এইবার কিরীচ ও গাণ্ডীবের কথা কিছু বলি। তাহারা

উভয়েই চিকীর্ষার প্রেমে আকণ্ঠ ডুবিতে লাগিল এবং ডুবিতে যে লাগিল তাহা বেশ বুঝিতেও পারিল। আমার পিতৃদেব মাঝে মাঝে বলিতেন, প্রেম যেখানে যত অধিক গভীর সেখানে তাহার প্রকাশ ততই অল্প। তিনি বলিতেন, প্রেম মীনধর্ম্মী—ক্ষুদ্র মীন অল্প সলিলেই সলীল হইয়া থাকে, কিন্তু বৃহৎ মীন গভীর জলতলে থাকে এবং তাহার অস্তিত্ব সহজে জ্ঞাপন করে না।

এতদ্ভিন্ন মজা হইল এই যে, কিরীচ ভাবিতেই পারিত না যে গাণ্ডীবের মত বীরপুরুষের মনে প্রেমের মতন কমনীয় বস্তু প্রবেশ করিতে পারে এবং গাণ্ডীব কল্পনাই করিতে পারিত না যে কিরীচের মতন অমন সুপক্ক তীরন্দাজকে কন্দর্পের তীর কখনও কাবু করিতে পারিবে। দুজনেই চিকীর্ষা সম্পর্কে তাহাদের দুর্ব্বলতা পরস্পরের নিকট হইতে গোপন রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিত। কিরীচ সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত পাছে গাণ্ডীব বুঝিতে পারে সে চিকীর্ষার প্রেমাকাঙ্খী এবং গাণ্ডীব সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত চিকীর্ষার প্রতি তাহার প্রেম মনেই গোপন রাখিতে। এইভাবে কিছুদিন চলিল। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না।

কিরীচের নূতন কাব্য গ্রন্থ প্রকাশত হইল।

গাণ্ডীবের প্রকাশিত হইল নূতন উপন্যাস।

কাব্যামোদিগণ একবাক্যে কহিল 'এমন কাব্য ইতিপূর্ব্বে রচিত হয় নাই।'

উপন্যাসামোদিগণ একবাক্যে কহিল 'এমন উপন্যাস পূর্ব্বে কেহ লিখে নাই।

কিন্তু দুইটীর মধ্যে তুলনায় কোনটী শ্রেষ্ঠ তাহা কেহ বলিতে পারিল না। চিকীর্ষা দুইটী গ্রন্থই উপহার পাইল, কিন্তু একটী পূর্ব্বে পড়িলে যখন অন্যটীর প্রতি অবিচার করা হয় এবং চক্ষু দুইটী থাকা সত্ত্বেও যখন দুইটী গ্রন্থ এক সময়ে পাঠ করা সম্ভব নহে, তখন কোনটীই পড়া উচিত নয় ঠিক করিয়া চিকীর্ষা দুইটী গ্রন্থই সযত্নে স্যুটকেসে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। কিরীচের সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে সে কহিল, 'অতি আশ্চর্য্য' এবং গাণ্ডীবের প্রশ্নের উত্তরে সে কহিল, 'অতুলনীয়'। এই জন্যই তো বলি স্ত্রী-জাতিকে কস্মিনকালেও বিশ্বাস করিতে নাই। কিন্তু কিরীচ এবং গাণ্ডীব দুজনেই বিশ্বাস করিল। কিরীচ ভাবিল 'আমার কাব্য যাহার এত ভাল লাগিয়াছে আমাকেও নিশ্চয়ই তাহার ভাল লাগে।' গাণ্ডীব ভাবিল 'আমাকে চিকীর্ষা নিশ্চয়ই ভাল বাসিয়াছে। নতুবা আমার উপন্যাস তাহার এত ভাল লাগিল কেন?'

তখন এখনকার মত তরুণগণ অতি-আধুনিক নেশাগ্রস্ত হয় নাই; সভ্যতা ও ভব্যতার সীমা অতিক্রম করাকে সজীবতার লক্ষণ বলিয়া গর্ব্ব করার মত গব্য বুদ্ধি তখনও তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। সুতরাং কিরীচ ও গাণ্ডীব মনে করিল, চিকীর্ষার নিকট অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করার পূর্ব্বে তাহা একবার চিকীর্ষা-জনক খালিতের নিকট উন্মুক্ত করা উচিত।

একদিন অতি গোপনে কিরীচ খালিতের সমীপে থরথর

কণ্ঠে যে আবেদন জানাইল তার সারমর্ম্ম এই, 'আমি আপনার জামাতা হইলে কিরূপ হয়?' খালিত কহিলেন 'মন্দ কি?'

পরদিন অতি গোপনে গাণ্ডীব যে আবেদন জানাইল, তাহারও ঐ একই সারমর্ম্ম। এবং উত্তরে খালিত কহিলেন, 'বেশ তো।'

অতঃপর দুইজনই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল চিকীর্ষার রাতুল চরণপদ্ম যুগলে প্রেম-অঞ্জলি প্রদান করিবার। দুজনেই সমান উৎসুক। সুতরাং সুযোগ দুজনেরই মিলিল।

তাহাদের প্রেম নিবেদন শুনিয়াই চিকীর্ষা বিস্মিত হইল, কারণ তাহারা দুজনেই যে তাহার প্রেমে এরূপ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহা সে পূর্ব্বে জানিত না। অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে প্রেম-ব্যাপার তো দূরের কথা, রাজ্যশাসন ব্যাপার পর্য্যন্ত সুচারু রূপে সম্পন্ন করা যায় না। প্রেম-ব্যাপারে চিকীর্ষার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং কিরীচ ও গাণ্ডীবের প্রেমাঞ্জলির কোন সৎ বা অসৎ, সুশোভন বা অশোভন, উত্তর দিতে পারিল না। উভয়েই চিকীর্ষার এই মৌনংকে 'সম্মতি-লক্ষণং' বলিয়া ধরিয়া নিল এবং চূড়ান্ত প্রস্তাব করিবার জন্য পঞ্জিকা দেখিয়া শুভদিন শুভলগ্ন স্থির করিতে লাগিল। কিন্তু বহু লগ্ন বিফল হইয়া যাইতে লাগিল, কারণ লগ্ন যখন ভাল থাকে তখন চিকীর্ষাকে সুবিধামত পাওয়া যায় না এবং চিকীর্ষাকে যখন সুবিধা-মত পাওয়া যায় তখন লগ্ন ভাল থাকে না। এইভাবে চিকীর্ষা এবং শুভ লগ্নকে এক সঙ্গে সুবিধামত না পাওয়াতে কিরীচ ও

গাণ্ডীবের বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। তখনও কিরীচ ও গাণ্ডীব পরস্পরের চিকীর্ষা-প্রেম-নিমগ্নতার কথা কিছুই জানিত না।

গল্প অত্যন্ত লম্বা হইয়া যাইতেছে, সংক্ষেপ না করিলে চলিবে না। সুতরাং শীঘ্রই কিরীচ জানিতে পারিল যে, গাণ্ডীব চিকীর্ষাকে প্রাণাধিক ভালবাসে এবং চিকীর্ষাকে লাভ করিবার জন্য সে অত্যন্ত আকুল। গাণ্ডীবও জানিল কিরীচ চিকীর্ষার প্রেমকেই জীবনের আকাঙ্খার ধন বলিয়া জানিয়াছে। প্রেম-ব্যাপারে কিরীচ যে গাণ্ডীবের প্রতিদ্বন্দী এবং গাণ্ডীব যে কিরীচের প্রতিদ্বন্দী, তাহা প্রেম-ত্রিকোণের বিন্দুত্রয়ের কাহারও অজ্ঞাত রহিল না।

এইবার চিকীর্ষার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তাহার পক্ষে কিরীচ ও গাণ্ডীব দুইজনই সমান। দু'জনের কাহাকে সে শ্রেষ্ঠ মনে করিবে, তাহা সে বহু চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিল না।

প্রেম-ত্রিকোণকে প্রেম-সরলরেখায় পরিণত করিতে হইলে একটা বিন্দুকে বাদ দেওয়া আবশ্যক। কিরীচ এবং গাণ্ডীব— এই দুটী বিন্দুর একটি বিন্দুকে বাদ দিতেই হইবে। কিরীচ ও গাণ্ডীব মহা সমস্যায় পড়িল।···

এইবার কি হইল বল দেখি?"

গল্প থামাইয়া চাণক্য ঈষৎ হাসিয়া চন্দ্রগুপ্তের মুখের দিকে তাকাইলেন। সামান্য কিছু সময় চিন্তা করিয়া চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন।

'কিরীচ এবং গাণ্ডীব ছলে বা কৌশলে পরস্পরকে প্রেম-ত্রিকোণ হইতে সরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।'

চাণক্য কহিলেন "মূর্খ! মূর্খ! তাহা হইলে এ তো সাধারণ গল্প হইত। এবং তাহা হইলে তোমাকে এ গল্প বলিবার আমার কি প্রয়োজন ছিল? আমি না থাকিলে তোমার যে কি উপায় হইত তাহা চিন্তা করিতেও আতঙ্ক হয়।

শুন। কিরীচ ও গাণ্ডীব ছিল আত্মত্যাগ-ব্রতে ব্রতী। যখন উভয়ে উভয়ের চিকীর্ষা-প্রেমোন্মত্ততার কথা টের পাইল তখন উভয়েই মনে মনে আত্মত্যাগের কঠোর প্রতিজ্ঞা করিল। কিরীচ প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণপণ চেষ্টায় সে নিজকে এই প্রেম-ত্রিকোণ হইতে সরাইয়া দিবে, যেন চিকীর্ষা ও গাণ্ডীব দুজনে মিলিয়া একটী সরলরেখা নির্ম্মাণ করিয়া সুখী হয়। গাণ্ডীবও প্রতিজ্ঞা করিল নিজের জীবনকে মরুভূমি করিয়া কিরীচের জীবনকে সুন্দর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিবে। উভয়ে একই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিল বটে, কিন্তু কেহ কাহারো প্রতিজ্ঞার কথা জানিল না। কিরীচ জানিল গাণ্ডীব চিকীর্ষার পাণি লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে; গাণ্ডীব জানিল কিরীচ চিকীর্ষাকে লাভ না করিয়া ছাড়িবে না। অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের চমৎকার সুযোগ পাইয়া দুজনেরি মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। চিকীর্ষা-রত্ন পাইবার আশা ত্যাগ করিতে হইবে এ কথা ভাবিয়া মন যত কাঁদিল, আত্মত্যাগ ততই গভীর মনে করিয়া তেমনি অন্য দিকে মন আনন্দেও ভরিয়া উঠিল।

কিরীচ ও গাণ্ডীব উভয়েই প্রেম-ত্রিকোণ পরিত্যাগ করিল; কারণ কিরীচ চাহিল গাণ্ডীবের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে এবং গাণ্ডীব চাহিল কিরীচের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে। ফলে প্রেম-ত্রিকোণ ভাঙ্গিয়া গিয়া রহিল শুধু একটি বিন্দু—চিকীর্ষা।

কিন্তু এভাবে বেশীদিন চলিল না। কিরীচ ও গাণ্ডীব উভয়েই উভয়ের গোপন চালাকী বুঝিয়া ফেলিল, কারণ তাহারা তো আর মূর্খ ছিল না! তাহারা দেখিল এভাবে চুপ করিয়া থাকিলে ব্যাপারটা কিছুতেই মিটিবে না। একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করা আবশ্যক।

কিরীচ গাণ্ডীবকে নানা ছলে ভুলাইয়া চিকীর্ষাকে বিবাহ করিতে রাজী করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গাণ্ডীবও কিরীচকে তাহাই করিতে লাগিল। আত্মত্যাগ করিবার বাসনা তাহাদের তুই জনেরই এত প্রবল যে, প্রতিজ্ঞা হইতে কেহই এতটুকু টলিল না। চেষ্টা করিতে করিতে উভয়ে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সাফল্যের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। প্রেমের নেশায় লোকে যেমন ভীষণ ভাবে মাতে, আত্মত্যাগের নেশায় তেমনি ইহারা ভীষণভাবে মাতিয়া উঠিল। তু'জনেই প্রেম হইতে আত্মত্যাগকে বড় বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

ভাল কথায় যখন ফল হইল না তখন মন্দ কথা সুরু হইল। এতদিনের বন্ধুত্ব শক্রত্বে পরিণত হইল। ভীমকণ্ঠে কিরীচ কহিল, 'মঙ্গল চাও তো চিকীর্ষাকে বিবাহ করিয়া সুখী হও।' গাণ্ডীব কহিল, 'চিকীর্ষার পাণি গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য

কর। নতুবা বিপদ হইবে বলিয়া রাখিতেছি ।' উভয়ে উভয়ের জীবন সার্থক করিতে ব্যস্ত, ফলে দু'জনেরই জীবন অসার্থক হইয়া রহিল।

অবশেষে কিরীচ বলিল, 'এভাবে আর চলে না। একটা মীমাংসা করা দরকার।' গাণ্ডীব কহিল 'নিশ্চয়।' স্থির হইল অস্ত্রদ্বারা মীমাংসা হইবে। পঞ্জিকার সাহায্যে শুভদিন, শুভ-লগ্ন স্থির করিয়া তীর ধনুক হাতে লইয়া দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী চলিল পাহাড়ের উপর একটি নির্জ্জন স্থানে। স্থির হইল 'এক, দুই, তিন,' গণনা করিয়া উভয়ে উভয়ের দিকে তীর নিক্ষেপ করিবে। দু'জনের মধ্যে যে মরিবে তাহাকে আর চিকীর্ষার পাণি গ্রহণ করিতে হইবে না; যে বাঁচিবে সে চিকীর্ষাকে বিবাহ করিতে বাধ্য থাকিবে। দুজনে একই সময় তীর নিক্ষেপ করিল। কিরীচের তীর গাণ্ডীবের সার্দ্ধ দুই হস্ত দূর দিয়া চলিয়া গেল, এবং গাণ্ডীবের তীর কিরীচের সার্দ্ধ তিন হস্ত দূর দিয়া চলিয়া গেল। উভয়েই ক্রোধে লোহিত বর্ণ ধারণ করিল।

কিরীচ কহিল, 'তুমি ইচ্ছা করিয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছ।'

গাণ্ডীব কহিল, 'চালুনী হইয়া ছুঁচকে ফুটা বলিতে লজ্জা হয় না?'

কিরীচ কহিল, 'তুমি আমাকে ফাঁকিবাজ বলিতেছ?'

গাণ্ডীব কহিল 'তুমি বলিতে চাও আমি মিথ্যাচারী?'

এইভাবে মস্তিষ্ক উষ্ণ হইতে উষ্ণতর হইতে হইতে ক্রোধে

তীর ধনুক ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া কিরীচ কহিল, 'মুখ সামলাইয়া কথা বলিস্ গাণ্ডীব।'

গাণ্ডীবও সক্রোধে তীর ধনুক ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'আমার মুখ আমি সামলাই বা না সামলাই তাতে তোর কি?'

কিরীচ সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া গাণ্ডীবকে আক্রমণ করিল, গাণ্ডীবও ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় বিপরীতাক্রমণ করিল। ফলে যে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহা সবিশেষ বর্ণনা করিতে গেলে আমার আজ আর স্নান করা হইবে না। সুতরাং এক বিরাট লম্ফে যুদ্ধপর্ব্ব অতিক্রম করিয়া উপসংহারটুকু বলি। ভীষণ যুদ্ধ করিতে করিতে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে বহু নিম্নে পতিত হইয়া প্রেম ত্রিকোণের দুইটি বিন্দু বহু বিন্দুতে পরিণত হইল।

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "গুরুদেব! যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি। এই কাহিনীটি যাহার নির্ম্মিত তিনি যদি স্বয়ং আপনি না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার সহিত গল্পিকার নিশ্চয়ই অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। কারণ এরূপ ঘটনা একেবারেই অসম্ভব।"

"তোমার পৃথিবীর লোকের আত্মত্যাগ শিক্ষা করার কল্পনাও তেমনি অসম্ভব।" বলিয়া চাণক্য স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

ভূমিকম্প

হঠাৎ যে কি হইয়া গেল প্রথমটা বুঝিতে পারিলাম না। এবং যাহা হইয়া গেল তাহা হইবার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বোধ হয় অজ্ঞানই হইয়া ছিলাম। যখন জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম, তখন সর্ব্বাঙ্গে একটা অদ্ভুত অবর্ণনীয় মৃদু বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। দু'একটা জায়গায় ছালচামড়া উঠিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু বুঝিলাম ভগবানের কৃপায় অথবা অন্য কোন কারণে কোথাও হাড় ভাঙ্গে নাই বা মচকায় নাই। মাথায় কিসের চোট লাগিয়া একটা জায়গা ফুলিয়া গিয়াছিল। রক্ত ঝরিতেছিল কি না, তাহা অন্ধকারে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

ব্যাপারটা এমন বিশ্রী রকম আকস্মিক ভাবে হইয়া গিয়াছিল যে, ঐ ধরণের ব্যাপারে অনভ্যস্ত আমার মাথার ভিতরে এক মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ত্তমান অবস্থার ঠিক আগেকার অবস্থাটা খুব পরিষ্কার ভাবে মনে করিতে পারিতেছিলাম না। কেবল ভাসা ভাসা ভাবে মনে পড়িতেছিল, কি যেন একটা কাজে একটা অতি পুরাতন দোতলা আধভাঙ্গা দালানের একতলার একটা ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেখানকার কাঁপুনি তখন ভাল করিয়া থামে নাই। ব্যাপারটা ক্রমে যখন বোধগম্য হইল,

তখন গায়ের রক্ত হিম হওয়া কাহাকে বলে তাহা বুঝিলাম। ভূমিকম্পে দালানটা নামিয়া পড়িয়াছে পাতালের দিকে, এবং জীবন্ত সমাধিলাভের সম্ভাবনাই আমার বেশী। উপরে একটু ফাঁক ছিল বাতাস আসিবার, সেই জন্য নিঃশ্বাস ফেলিবার বাতাস পাইতেছিলাম। ভয় হইতেছিল, কোন সময় ঐ ফাঁক টুকু কোন রকমে পাছে বন্ধ হইয়া যায়, কারণ তাহা হইলেই দম আট্‌কাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতে হইবে।

উদ্ধারের কোন উপায় দেখিলাম না; মনে হইল মৃত্যু অনিবার্য্য। স্বপ্ন দেখিতেছি কি না তাহা পরীক্ষা করিবার যতগুলি প্রচলিত ও অপ্রচলিত নিয়ম মনে আনিতে পারিলাম, সবগুলিই কাছে লাগাইয়া দেখিলাম যে, আমার দুরবস্থাটা স্বপ্ন নহে, কঠোর সত্য।

ভাবিতে লাগিলাম—হায়! আমি আজ যে ভাবে মাটীর তলায় চলিয়া আসিলাম, সেই ভাবেই হয়তো অতীতের গৌরব গুলি—যাহা আজকাল মাটি খুঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে—মাটির তলায় প্রবেশ করিয়াছিল!

ভাবিতে লাগিলাম, সীতাদেবীর ছিল বটে বুকের পাটা; এমন সাংঘাতিক জায়গায় তিনি সাধ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন!

ভাবিতে লাগিলাম—এখনকার সভ্যতা যখন অতীত হইয়া যাইবে, সেই সুদূর ভবিষ্যতে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনকগণ হয়তো আমার দেহ পাইবেন। দেহ তো নয়, শুধু

কঙ্কাল। আমার কঙ্কাল দেখিয়া হয়তো তাঁহাদের মনে জাগিবে কত কল্পনা। কিন্তু কি করিয়া তাঁহারা জানিবেন আমার নাম ছিল রণেশ ঘোষ? কি করিয়া তাঁহারা জানিবেন যে পাতাল-প্রবেশের আগের দিন পর্য্যন্ত স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ক্লাশ করিয়াছিলাম?

হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। সবে মাত্র চিন্তা করিতে সুরু করিয়াছি নিজের একাকীত্বের কথা, এমন সময় পিছন হইতে কে যেন কহিল, "ম্যাচিস্ আছে বাবু?"

চমকিয়া ফিরিয়া তাকাইলাম। কিন্তু যাহার দিকে ফিরিলাম, অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না। নামমাত্র যে আলোটুকু ছোট একটু ফাঁকের মধ্য দিয়া পাতালপ্রবিষ্ট ঘরের ভিতরে আসিতেছিল, তাহা অন্ধকারটাকে একটু স্বচ্ছ করিতেছিল মাত্র। সেই স্বচ্ছ অন্ধকারে ম্যাচিস্-প্রার্থী লোকটিকে দেখিলাম, একটা ছায়ামূর্ত্তির মত! লোকটার কথা বলিবার ভঙ্গী এবং বিশ্রী কণ্ঠস্বরে আমার পিত্ত জ্বলিয়া গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাবিয়া মস্ত সান্ত্বনা পাইলাম যে, এই ভয়ানক বিপন্ন অবস্থায় আমার একজন সঙ্গী রহিয়াছে। লোকটা যেমনই হোক না কেন, তবু মানুষ তো; এমন অবস্থায় ভেদাভেদ না ভুলিয়া উপায় নাই।

লোকটার ম্যাচিস্ প্রার্থনায় নিরাশার মধ্যেও যেন ক্ষীণ আশার আলো দেখিতে পাইলাম। লোকটা কি ম্যাচিসের

সাহায্যে কোন উদ্ধারের উপায় করিবে না কি ? পর মুহূর্ত্তেই আমার এই ক্ষীণ আশার আলো নিভিয়া গেল।

লোকটা আমার নৈরব্য দেখিয়া আবার বলিল "আপনার কাছে ম্যাচিস্ আছে বাবু ? আমার বিড়িটা একটু ধরাব। ছেলো বটে আমার নিজের কাছে, কিন্তু হঠাৎ ঝাঁকানি খেয়ে টাল সামলাতে পারলুম না—সালার ম্যাচিস্ যে কোথায় ছিট্‌কে পড়ে গেল কে জানে ?"

এই ভয়াবহ মৃত্যু-ভবনে লোকটার প্রধান চিন্তা কি না বিড়ি ধরানো ! বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। অন্য সময় হইলে হয় তো হাসিয়া ফেলিতাম, কিন্তু হাসিবার মত মনের অবস্থা যেন ছিল না। মৃত্যুকে যে এমন আশ্চর্য্য অবহেলার চোখে দেখিতে পারে, সে হয় পশু, না হয় দেবতা। দুয়ের মধ্যে লোকটাকে কি মনে করিব ?

আমার দ্বিতীয় বারের নৈঃশব্দ্য লক্ষ্য করিয়া লোকটা তৃতীয়বার প্রার্থনা জানাইয়া কহিল, "থাকলে দিন না বাবু মেহেরবাণী করে। এমনি সালার অভ্যেস হয়ে গেছে যে বিড়ি না ফুঁকে দু'দণ্ড চুপচাপ বসে থাকতে জান হাঁফিয়ে ওঠে।"

আর চুপ করিয়া থাকা ভাল নয় দেখিয়া এইবার বলিলাম, "কি বললে ? ম্যাচিস্ ? না, ম্যাচিস্ তো নেই কাছে।" বাস্তবিকই আমার কাছে দিয়াশলাই ছিল না।

আমার নেতিবাচক জবাব শুনিয়া বেচারা যে আশাভঙ্গের

নিদারুণ বেদনা বোধ করিল, তাহা এই অন্ধকারেও বেশ বুঝিতে পারিলাম।

"তা হলে আমার সেই ম্যাচিস্‌টাই দেখি পাওয়া যায় কি না। আর খানিকক্ষণ বিড়ি না টেনে থাকতে হলে আমি সালার ঘড়কু ব্যাপারী আর বাঁচব না।" বলিয়া সে অন্ধকারে তাহার হারান ম্যাচিস্‌ এমন ভাবে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, যেন পরশ-মণি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

বলিলাম, "তোমার নাম বুঝি ঘড়কু ব্যাপারী ?"

ম্যাচিস্‌ খুঁজিতে খুঁজিতে লোকটা কহিল "আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। বান্দার নাম ঘড়কু ব্যাপারী।···কিন্তুক আড়াই কুড়ি বছর পেরিয়ে গেল বাবু, ঘড়কু ব্যাপারী এমন জব্দ কোনো দিন হয় নি!···ম্যাচিস্‌টা যে সালার কোথায় পালাল!··· আমি তো ভাবলুম আমার ভির্‌মি লাগল না কি! ভারী লজ্জা লাগল। ভিরমি লাগবে জেনানা লোকের মরদেরভির্‌মি ? ছি! ছি! ছি! তারপর বাবু বুঝলুম ভির্‌মি আমার লাগে নি।"

ভির্‌মিটা যে তাহার নহে, জননী বসুন্ধরার, এই জন্য ঘড়কু ব্যাপারীকে যেন অত্যন্ত আনন্দিত মনে হইতে লাগিল। এত বিপদের মধ্যেও লোকটার সান্নিধ্যে উদ্ভট ধরণের আনন্দ পাইলাম। প্রাণ যদি যায় সেও ভাল, তবু ভির্‌মি লাগার অপমানে যেন অপমানিত না হয়! অদ্ভুত লোক!

বলিলাম, "আচ্ছা ব্যাপারী, তোমার ভয় করে না ?" ঘড়কু ব্যাপারী কহিল, "ভয় ? কিসের ভয় বাবু ?"

বলিলাম, "মরণের ভয় ?" ঘড়কু অদ্ভুত হাসি হাসিল। বলিল, "ওসব ভয়-ডর করে কিছু লাভ হয় না বাবু। ভয় করলে ভি মরতে হবে, না করলে ভি মরতে হবে।...কিন্তু ম্যাচিস্ যে কোন্ জাহান্নামে গেল ! পেলে একবার বেটাচ্ছেলেকে —আপনার ভয় করছে না কি বাবু ?"

ভয় যে সত্যই করিতেছিল, তাহা অস্বীকার করিয়া বিশেষ কিছু লাভের সম্ভাবনা অথবা তাহা স্বীকার করিলে কোন লজ্জার কারণ ছিল না। কাজেই বলিলাম, "ভয় হচ্ছে, হয়তো আর ওপরে উঠতে পারব না।"

কথাটা বলিয়াছিলাম অতিশয় করুণ স্বরে ; ইচ্ছা করিয়াই আমার কণ্ঠস্বরকে করিয়াছিলাম যথাসম্ভব করুণ। কারণ আশা করিয়াছিলাম আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য অন্ততঃ ঘড়কু ব্যাপারী কিছু ভরসার কথা বলিবে। নিরাশার মাঝখানে কাহারও মুখে আশার বাণী শুনিলে সে বাণী বিশ্বাস না করিলেও মনে অনেকটা শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু আমাকে ভয়ানক দমাইয়া দিয়া ব্যাপারী দেশলাই খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল, "তা একরকম মন্দ বলেন নি বাবু। আবার সেই রকম আর একটা কাঁপুনি সুরু হলেই হয় তো আরো নীচে চলে যেতে পারি।... কিন্তু তার আগে বিড়িটা যে শেষ করা চাই। গলা একবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।"

খানিক পরেই বোধ করি আমার মানসিক দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া তাহার সহানুভূতির উদয় হইল। সে বলিল, "আপনি

ভাববেন না বাবু। কিছু ডর করবেন না। কাঁপুনি যে ফের সুরু হবে, এমন তো মালুম হচ্ছে না। ভলান্টিয়ার ব্যাটারা দেখবেন ঠিক টেনে তুলবে, সুধু একটু সবুর করে থাকুন।”

বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, “বল কি ব্যাপারী ?”

ব্যাপারী দেশলাই খুঁজিতে খুঁজিতে কহিল, “হক কথা বলছি বাবু। ও ছোঁড়ারা একবার খবরটা পেলেই হয়। খন্তা, শাবল, কুড়ুল, কোদাল—সব নিয়ে ছুটে আসবে। মাথায় একবার খেয়াল চেপেছে কি—ব্যাস! তখন আর ছোঁড়াদের হুঁস থাকে না।”

দেশলাইটাকে আর একবার একটা কঠোর অভিশাপ দিয়া ব্যাপারী কহিল, “আপনি ভলান্টিয়ারী করেন নি বাবু ?”

বলিলাম যে ও কর্ম্ম কোন দিন আমা দ্বারা সম্ভব হয় নাই। ঘড়কু ব্যাপারী অধীর ভাবে দিয়াশালাই খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভলান্টিয়ারদেব উল্লেখে একটু ভবসা পাইতেছিলাম। প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, ব্যাপারীর কথা যেন সত্য হয়। প্রিয় প্রসঙ্গটি আবার তুলিলাম।

বলিলাম, “সত্যি সত্যি ভলান্টিয়াররা আসবে মনে কর ব্যাপারী ?”

“আলবাৎ আসবে বাবু।” বেশ একটু জোরাল ভাবেই ঘড়কু বলিল। “আপনি বুঝছেন না বাবু, আমাদের বাঁচবার যত সখ, তার চাইতে আমাদের বাঁচাবার সখ যে ভলান্টিয়ার

পাগলাদের ঢের বেশী। ও ব্যাটারা এতক্ষণে ঠিক ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়েছে। যত সব মাথা-পাগলার দল।”

আমি বলিলাম, “মাথা-পাগলার দল? কেন, লোকের প্রাণ বাঁচান কি পাগলামীর কাজ না কি? লোকের সেবা করা, উপকার করা—সে যে মস্ত ধর্ম্ম।”

ঘড়কু ব্যাপারী কহিল, “রেখে দিন বাবু ধর্ম্মো। ওসব ধম্মো ফম্মো কিছু নয়···সব ফাঁকি। ওতে কি লাভ হয় বলুন তো! লোকের জান গেলেই আমার কি, থাকলেই বা আমার কি! কিন্তু সালার ম্যাচিস্‌কে আমি খুঁজে বার করবই করব, তবে আমার নাম ঘড়কু ব্যাপারী।···আপনার মনে নেই বাবু, সেই যেবার সালারা ঠিক করলে মদ খাওয়া বন্ধ করে দেবে? আরে বাপু, আমরা খাচ্ছি তো খাচ্ছি, তাতে তোদের কি? তোদের বাপের পয়সায় খাচ্ছি? আমাদের পয়সায় আমাদের যা খুসী খাব। ও সালাদের জন্যেই অনেকে নূতন করে মদ খাওয়া ধরল বাবু।”

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, “কি করে?”

ব্যাপারী বলিল, “জেদ করে। এই আমার কথাই ধরুন না। আমি তো মদ খেয়ে খেয়ে জ্বালাতন হয়ে ঠিক করলুম আর মদ ছোঁব না। মাইরি বলছি বাবু, মিছে কথা কয় কোন সালা? যেমনি ঠিক করলুম, অমনি সালার ভলান্টিয়াররা দেখি মদের পেছনে লেগেছে। মদের দোকানে কি না বলে? —ইয়ে আরম্ভ করেছে।”

বুঝাইয়া দিলাম যে 'ইয়ে'র জায়গায় হইবে 'পিকেটিং।' খুসী হইয়া ব্যাপারী কহিল, "আজ্ঞে হঁ্যা, আপনারা লেখাপড়া জানা লোক, আপনাদের এ সব মনে থাকে। আপনাদের কি আর— আপনার বুঝি সিগ্রেট ফিগ্রেটের অভ্যেস নেই বাবু?"

প্রশ্ন করিলাম, "কেন?"

ব্যাপারী কহিল, "থাকলে সঙ্গে একটা ম্যাচিস্ থাকত হয়তো।······হঁ্যা, ঐ ভলান্টিয়ার ব্যাটাদের কাণ্ড দেখে আমার আর মদ ছাড়া হল না। ভাবলুম বেড়ে মজা পাওয়া গেছে। তামাসা করে মদ খেতে লাগলুম। এক সালা ভলান্টিয়ার আমায় মদের দোকানে ঢুকতে বারণ করতে এসে এমনি রাম লাথি খেয়েছিল বাবু, যে কি আর বলব!"

বলিলাম, "ছিঃ ব্যাপারী! ও তোমার ভারী অন্যায় হয়েছিল। তোমাদের ভালর জন্যেই তো মদ খেতে ওরা বারণ করেছিল।"

দেশালাই খুঁজিতে খুঁজিতে ঘড়কু ব্যাপারী কহিল, "ভালর জন্যে, না হাতী। আমরা গরীব-গরবা মানুষ, এক আধটা নেশা-টেশা না করে কি করে থাকি বলুন? পেটে ভাল করে যখন দানা দিতে পারতুম না, তখন নেশায় চুর হয়ে পড়ে থাকতুম, সস্তা মদ খেয়ে। এ কি কম সুবিধে? আর ঐ যে মেথরগুলো রাত থাকতে উঠে গাড়ী নিয়ে বেরোয় পায়খানার ময়লা সাফ করতে, মদ না খেলে অমন নোংরা কাজ ক'দিন করতে পারবে? হুঁঃ! ভালর জন্যে, না হাতী! অত যদি দরদ হয়ে থাকে তো ভলান্টিয়াররা টানুক না দুদিন ময়লার

গাড়ী। ও সব সালাদের আমার জানা আছে বাবু। আপনার ভাগ্যি যে আপনি ভলান্টিয়ার নন—ঘড়কু ব্যাপারী ভলান্টিয়ারদের দু'চোখে দেখতে পারে না।"

আমার সৌভাগ্যের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। ঘড়কু দেশলাই খুঁজিতে লাগিল।

অদ্ভুত ঘড়কু! নিশ্চিত নির্ম্মম মৃত্যুর ঘন অন্ধকারে সে বিড়ি ধরাইবার জন্য তাহার হারানো দিয়াশলাই খুঁজিতেছে! আমার মনে হইতে লাগিল—হায়! আমিও যদি ঘড়কু ব্যাপারীর মত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম!

কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর নিশ্চিত আভাস পাইয়াও কাহারও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, সে মরিবে। ভীষণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আমি বাঁচিবার আশা করিতে লাগিলাম। সে যেন মরণ-সিন্ধু-তীরে দাঁড়াইয়া জীবনের জয়-গান।

বলিলাম, "কিন্তু এখন উপায় কি করা যায় বল তো ব্যাপারী?"

ব্যাপারী বলিল, "উপায় কিছু করবার নেই বাবু। যা করবার তা ভলান্টিয়াররাই করবে। আমাদের চাইতে ওদেরই বেশী মাথাব্যথা কি না।...ম্যাচিসটা কি আর মিলবেই না না কি? একটা হেরিকেন লণ্ঠন থাকলে ভাল হত।"

হঠাৎ ঘড়কু ব্যাপারী আনন্দে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রশ্ন করিলাম, "কি হল ব্যাপারী?"

ঘড়কু ব্যাপারী কহিল, "পাওয়া গেছে বাবু এতক্ষণে।

সালার সাধ্যি কি ঘড়কু ব্যাপারীকে এড়িয়ে থাকে? এবার ধরিয়ে ফেলি চট্‌পট্‌ বিড়িটা। নইলে ফের যদি হঠাৎ ভুঁইয়ের ভিরমি সুরু হয়, তা হলে বিড়ি সালাকে আর ফোঁকা যাবে না।"

মাত্র একটি কাঠি ছিল সম্বল। এই কাঠিটি যদি কোন প্রকারে বিফলে যায়, তাহা হইলে আর বিড়ি ধরান হইবে না। কাজেই বিড়িটা ঠোঁটে চাপিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ রাখিয়া—পাছে নিঃশ্বাস লাগিয়া কাঠির আগুন নিভিয়া যায়—অতি সাবধানে ঘড়কু ব্যাপারী কাঠিটা জ্বালিল। এতক্ষণ ধরিয়া যে গভীর কৌতূহল মনের মধ্যে পোষণ করিতেছিলাম, তাহা এইবার ক্ষণিকের জন্য মিটিল। দেশলাইয়ের কাঠির স্বল্প প্রদীপে ঘড়কু ব্যাপারীর মুখ দেখিতে পাইলাম। মুখ দেখিয়া সৌন্দর্য্য বা কৌৎসিত্যের কথা মনেই আসিল না। শুধু একটি জিনিষ এত গভীরভাবে লক্ষ্য করিলাম যে, তাহাই আমার সারা মন জুড়িয়া রহিল। সে মুখের পরম নিশ্চিন্তভাব দেখিয়া হিংসা হইতে লাগিল ঘড়কু ব্যাপারীর উপর। বাঁচিবার তো কোন আশাই দেখিতেছি না ভলান্টিয়াররা আসিয়া যে উদ্ধার করিবে, তাহা গাঁজাখুরী কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়, ঘড়কু ব্যাপারীও মরিবে, আমিও মরিব ; কিন্তু আমি মরিতেছি তিলে তিলে এবং ঘড়কু ব্যাপারী হয় তো মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পর্য্যন্ত বাঁচার আনন্দ পরম নিরুদ্বেগে ভোগ করিবে।

বিড়ি টানিতে টানিতে ব্যাপারী বলিল, "আর একটা কাঁপুনি সুরু হবেই, কি বলেন বাবু?"

ভয় পাইয়া কহিলাম, "না না, তা হবে কেন? দেখছ না একেবারে থেমে গেছে?"

ব্যাপারী কহিল, "কিন্তুক্ হওয়া যে বড্ড দরকার বাবু। এম্নি করে কদ্দিন বসে থাকব? যা হবার ঝট্‌পট্ হয়ে যাক। আমি ঘড়কু ব্যাপারী—বুঝলেন বাবু?—বরাবর ঝট্‌পট্ ভালবাসি। একেবারে পাঞ্জাব মেল—গরুর গাড়ী নয়।"

বলিলাম, "কেন, তুমি যে বললে ভলান্টিয়ার—"

হাসিয়া বিড়িটা ঠোঁট হইতে সরাইয়া ব্যাপারী কহিল, "আপনিও যেমন! ও ব্যাটারা কবে তক্ আসবে তার কি কোন ঠিক আছে? ততদিন কি আর আমরা টিকে থাকব?"

এমন সময় বাস্তবিকই আবার কাঁপুনি সুরু হইল। সে কাঁপুনিটা আমার, না পৃথিবীর, তাহা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় ব্যাপারী বলিল, "যা ভেবেছি, তাই সুরু হল! বিড়িটাকে আর শেষ করতে দেবে না দেখছি।"

বলিয়া চূড়ান্ত একটা কিছু হইয়া পড়ার আগে বিড়িটা শেষ করার উদ্দেশ্যে সে বিড়িতে একটা প্রচণ্ড টান দিল। কিন্তু বিড়িটা তাহার আর শেষ করা হইল না, কারণ কয়েক সেকেণ্ড পরেই আমরা দুজনেই ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়িয়া মারা পড়িলাম।

অণিমার প্রেম

"আমায় একটা ভিক্ষা দেবে অরুণ?" করুণ কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন কর্‌ল অণিমা। কণ্ঠস্বর অন্য যে কোনো দিনের কণ্ঠস্বর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অরুণ চম্‌কে উঠলো। কি হয়েছে আজ অণিমার? "কি ভিক্ষা অণু?" প্রশ্ন করল অরুণ।

"আগে বলো দেবে, তারপর বলব।"

"আমার দেবার ক্ষমতার বাইরে যদি না হয় তো নিশ্চয় দেবো। তুমি তো জানো তোমায় অদেয় আমার কিছুই নেই।"

অণিমা কি যেন বলি বলি করেও বল্‌তে পারছিল না। আবেগে তার দুটী ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছিল। দু চোখে অশ্রু যেন এখনি ঝরে পড়বে। অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে অণিমা বল্‌ল "তাহলে আমার আংটী আমায় ফিরিয়ে দাও, তোমার আংটী তুমি ফিরিয়ে নাও।" বলে' নিজের হাতখানা অরুণের দিকে বাড়িয়ে দিল; উদ্দেশ্য—যে আঙুলে অরুণ নিজের হাতে তার আংটি পরিয়ে দিয়েছিল সে আঙুল থেকে আবার নিজের হাতেই অরুণ তার আংটী খুলে নেবে।

তাদের বিয়ের কথাবার্ত্তা সব ঠিক হয়ে গেছে, দু পক্ষেরই শুধু মতে নয়—একান্ত আগ্রহে। আংটী-বদল পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, শুধু মালাবদল বাকী। এর মধ্যে এমন ভয়ানক কি ঘটে গেল যাতে অণিমা আজ এমন ভিক্ষা চাইছে?

"এ তুমি কি বল্‌ছো অণু ?" অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করল অরুণ। "আমার মনের কথাই বল্‌ছি।" অণিমা জবাব দিল। "না না, কোনো অসুখ করে নি আমার। সত্যি বলছি এই আমার আন্তরিক ভিক্ষা। আমি বাগ্‌দত্তা, তুমি স্বেচ্ছায় যদি আমায় মুক্তি না দাও তাহলে এ বন্ধন থেকে ছাড়া পাবার আমার উপায় নেই অরুণ। তুমি আমায় মুক্তি দাও।" অণিমা এবার ঝর্‌ ঝর্‌ করে' কেঁদে ফেল্‌ল। আঁচল দিয়ে ছুচোখ ঢেকে ফেল্‌ল সে।

অরুণ দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লো তার নিজের দিক থেকে কোনো রকম ত্রুটি হয়েছে কিনা যার জন্যে কোনো ভুল ধারণার উদ্ভব হতে পারে অণিমার মনে। একটিও মনে পড়লো না অরুণের। ঈর্ষ্যা ? তা-ও হবার সম্ভাবনা নেই। অরুণ অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গেই তো এমন অন্তরঙ্গ ভাবে মেশে না যা থেকে কোনো সন্দেহ-বিলাসীর মনেও কোনোরকম সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে! বলতে গেলে অরুণ মেয়েদের সঙ্গে পারত-পক্ষে মিশতই না। শুধু অণিমাকে অত্যন্ত ভালো লেগেছিল তার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য এবং সারল্যের জন্য। বিদ্যা ছিল অণিমার কিন্তু সেটা জাহির করবার চেষ্টা ছিল না। রূপ ছিলো, কিন্তু সে সম্বন্ধে ততটা সচেতন সে ছিল না এবং উগ্র আধুনিক ফ্যাসানে রূপকে ঝাঁঝালো করে' তোলার সাধনার প্রতি আগ্রহ তার ছিল না। সহরে বাস করেও অণিমা সহুরে মেয়ে হয় নি বলেই তাকে অরুণের অত ভালো লেগেছিল। অরুণের প্রেম

অণিমা সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল। কিন্তু আজ এ কি হল অণিমার? নিজকে একটু সামলে নিয়ে অণিমা বলল কাল সারা রাত আমি ভেবেছি অরুণ। ভেবে দেখেছি এ বিয়ে আমাদের হওয়া উচিত নয়। এ শুধু বালুর উপর বাসা বাঁধবার চেষ্টা। আমি চাই না এ ভুলের স্বর্গ।"

"তার মানে?"

"তুমি দুঃখ পাবে হয় তো। কিন্তু অপ্রিয় সত্য সহ্য করবার ক্ষমতা তোমার আছে বিশ্বাস করি বলেই তোমায় বলছি আমার প্রতি তোমার যে প্রেম তারি সম্বন্ধে আমি গভীর ভাবে চিন্তা করে' দেখেছি, বুঝেছি এ প্রেম মিথ্যে, এ প্রেম ফাঁকি দিয়ে মন ভুলানো।"

অরুণের মন ব্যথায় ভরে উঠলো। অণিমার প্রতি তার ভালবাসা যদি ফাঁকি হয় তাহলে পৃথিবীতে কেউ কোনোদিন ভালোবাসে নি, ভালো বাস্‌বেও না।

ব্যথিত কণ্ঠে সে বলে উঠলো "তার মানে, তুমি বলতে চাও আমি প্রেমের কথা বলে তোমায় এতদিন শুধু ঠকিয়ে আসছি?"

"না না, তুমি আমায় ভুল বুঝো না অরুণ। তুমি ইচ্ছে করে আমায় ঠকিয়েছ তা আমি বলি না। তুমি নিজেকেও যে ঠকিয়েছ আর সেই সঙ্গে আমাকে ঠকিয়েছ, তা তুমি নিজেও বুঝতে পারো নি। তার মানে, ব্যাপারটা তুমি মোটেই তলিয়ে দেখ নি বলেই রাঙ্‌তাকে সোনা বুঝেছ, আমাকেও তাই বুঝিয়েছ।"

এইবার অরুণের মনে একটু আশার সঞ্চার হ'লো। বোঝা গেল প্রেমের কোনোরকম দার্শনিক ব্যাখ্যা নিয়ে সম্ভবতঃ অণিমার মনে খটকা লেগেছে।

অণিমা প্রশ্ন করলো "আমার কয়েকটী প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেবে অরুণ? ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে না?"

"না। বলো তোমার কি জানবার আছে।"

"আমি কি সত্যিই সুন্দরী?"

"এ কথা আমার মুখ থেকে না শুনলে কি তোমার তৃপ্তি হবে না অণু?"

"না। আমি তোমার মুখ থেকে খাঁটি কথাটী শুনতে চাই।"

"হ্যাঁ, সত্যিই তুমি সুন্দরী অণু।"

"আমার রূপে মুগ্ধ হয়েই কি তুমি আমার প্রেমে পড়ো নি?"

"যদি বলি তাই পড়েছি?"

"আমি যদি সুন্দরী না হয়ে কুৎসিৎ হতুম, যদি ফরসা না হয়ে বিশ্রী কালো হতুম, তাহলেও কি তুমি আমার প্রেমে পড়তে?"

"তার মানে তুমি যদি তুমি না হতে তাহলে আমি তোমায় এম্নি করেই ভালবাসতুম কিনা। এ প্রশ্নের কোনো মানে হয় না অণু, এ একেবারে অবাস্তর।"

"মোটেই নয়। এ হচ্ছে তোমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার একটা ফন্দী মাত্র। এ কবিতাটা একবার পড়ে' দেখবে?"

বলে' সে অরুণের হাতে দিল একটা পুরাণো সাপ্তাহিক কাগজে ছাপা কবিতা—"কালো মেয়ে।" অরুণ পড়তে লাগল:

"খোলা জানালায় এলোচুলে একা রঙীণ গোধুলি বেলা
রূপহীনা কালো মেয়ে
বসে বসে দেখে আকাশে রঙের খেলা
অনিমেষ চোখে চেয়ে
দেখে লাল নীল হলুদ বেগুনী গোলাপী সবুজ সাদা—
নামী ও অনামী কত না রঙের মেলা।
কল্পনা তার মানে না কাছের বাধা,
সুদূরে ভাসায় ভেলা।......"

তারপর কবি বর্ণনা করেছে রূপহীনা কালো মেয়ের কল্পনা এবং স্মৃতির অভিযান। তার বান্ধবীরা কুমারী আর কেউ নেই। তাদের চিঠি আসে, তাতে থাকে তাদের নতুন জীবনের রঙীণ ছবি আঁকা, কথার তুলি দিয়ে। এই রূপহীনা কালো মেয়েটার কাছে সে জীবন শুধু মরীচিকা মাত্র—কারণ কেউ ফিরে তাকায় না তার দিকে।

........."হে বিধাতা যেথা রূপের পিয়াসী সবে,
রূপ নাই যার কেন তারে আনো অপরূপ সেই ভবে?
যদি আনো তারে, প্রেমের প্রদীপ কেন জ্বাল তার প্রাণে?
অতনুর তীর কেন হায় তারে হানে?......"

তারপর:

......বাতায়ন জানে কালো সে মেয়ের সকরুণ ইতিহাস;
ভাবে 'হায় রূপহীনা!
ব্যর্থ হবে কি তোমার অশ্রু, তোমার দীর্ঘশ্বাস?

তোমার জীবন বীণা
বাজাবে কি শুধু ব্যথার করুণ সুর ?
রবে একাকিনী পাবে না পরশ প্রিয়তম বন্ধুর ?
বসে' আছ তুমি বরণমাল্য হাতে,
কেহ ত নিল না গলে,
তাই মোর পাশে কতদিন নিরালাতে
ভেসেছ অশ্রু জলে।......'

তারপর :

"গোধুলির রং যায় না তো আর দেখা
সাঁঝের আঁধার ধীরে ধীরে আসে ছেয়ে,
বসে কী যে ভাবে বাতায়নে একা একা
রূপহীনা কালো মেয়ে।......"

অণিমা ব্যাকুল-কণ্ঠে বল্‌ল "ভাব তো একবার এই মেয়েটীর ব্যর্থ জীবনের কথা! বেচারীর দুঃখের কথা ভেবে কাল সারাটা রাত কেঁদেছি। তোমাদের পুরুষ জাতটাই এম্নি। মেয়েদের তারা ভালোবাসার ভান করে, কিন্তু আসলে ভালবাসে তাদের নয়, তাদের রূপকে। এ আমি নিশ্চয় জানি, আমি যদি রূপহীনা কালো মেয়ে হতুম তাহলে আমার সঙ্গে প্রেমে পড়া তো দূরের কথা, আমার দিকে ফিরেও তাকাতে না। আমি চাইনে অমন প্রেম অরুণ, তুমি আমায় রেহাই দাও।"

এর কি জবাব দেওয়া যেতে পারে চিন্তা করতে করতে সাপ্তাহিক কাগজটার পাতা উল্‌টালো অরুণ, আনমনা ভাবেই।

জবাবটা সঙ্গে সঙ্গেই সাপ্তাহিক কাগজেরই পাতায় দেখা গেল ছাপার অক্ষরে কবিতায়। হাসি ফুটে উঠলো অরুণের মুখে। "রেহাই দেবার এবং নেবার কথা পরেই না হয় ভাবা যাবে অণু। এখন এই কবিতাটা শোনো।" বলে' অরুণ পড়তে লাগলো:

কালো ছেলে

খোলা জানালায় বসে' নিরালায় রঙীণ গোধূলি বেলা
রূপহীন কালো ছেলে
বসে' বসে' দেখে আকাশে রঙের খেলা
অনিমেষ আঁখি মেলে।...
পড়ে সে বেচারা সেই কলেজের তিন বছরিয়া ক্লাসে
ছেলেদের সহ-ক্লাসিনী হইতে মেয়েরাও যেথা আসে।
একে রূপ নেই, তায় নেই রূপো, রংটাও বড় কালো
তাই তার পানে তাকায়নি কেউ, বাসেনিতো কেউ ভালো।
ভাগ্যবন্ত বন্ধুরা হায় বধুর গল্প করে,
মধুর লাগে না তার,
মনের গোপন গহনে নীরবে অশ্রুবাদল ঝরে,
জীবন অন্ধকার।
বাতায়ন বলে "জানি জানি তোর সকরুণ ইতিহাস
ওরে রূপহীন রূপোহীন দুর্ভাগা!
কেন মিছে তুই ঝরাস অশ্রু ফেলিস দীর্ঘশ্বাস?
আশায় আগুন লাগা।

গলাটি বাড়ায়ে মিছামিছি কেন বসে থাকা খালি খালি ?
বরণমাল্য পরাবে যে কেউ সে গুড়ে যে তোর বালি।"
গোধূলির রং আঁধারে মিলায়ে যায়,
সাঁঝের আঁধার ধীরে ধীরে ওঠে ঠেলে.
বসে বসে কি যে ভাবে একা জানালায়
রূপহীন কালো ছেলে।...

পড়া শেষ করে অরুণ বল্‌ল "একবার ভেবে দেখ তো এই কালো রূপহীন এবং রূপোহীন ছেলেটার কথা! এর দুঃখের কথা ভেবে আমিও কি কাঁদতে পারি না? তুমি যে প্রশ্ন তুলেছো অণু, তার জবাবে আমিও পালটা প্রশ্ন করছি তোমাকে, তার সত্যি জবাব দিও। আমাকে তুমি এখন যেমন ভালোবাসো, আমি যদি এখন যা আছি তা না হয়ে কালো, কুৎসিৎ আর গরীব হতুম তাহলেও কি তুমি আমায় তেম্নি ভালোই বাসতে? কখ্‌খনো না, এ আমি নিশ্চয় জানি। তোমার প্রেমটাও ফাঁকি এবং আমারও উচিত তোমার এই ফাঁকি প্রেমকে গ্রহণ না করে' তোমার কাছে রেহাই ভিক্ষা চাওয়া। তাই নয় কি?"

তাই তো! ব্যাপারটা শুধু এক দিক থেকেই চিন্তা করেছিলো অণিমা; এর অন্যদিকটা তো ভেবে দেখে নি! ছিঃ, কি বিশ্রী ভুলই না হয়ে গেছে! তলিয়ে দেখতে হলে দুদিকই তলিয়ে না দেখলে ঠিক হবে কেন?

অরুণ ব্যাপারটাকে আরও বিস্তারিতভাবে বোঝাতে লাগলো অণিমাকে। প্রেম জিনিষটা দুতরফা ব্যাপার। কাজেই

এর যা কিছু বিচার করতে হবে দুদিক থেকে। তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে প্রেমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বার্থ। আমরা ভালবাসি কেন? ভালোবাসি ভালো লাগে বলে। গোলাপ ফুলকে বিশ্লেষণ করলে তার পাপড়ি শিরা উপশিরা প্রভৃতি অনেক কিছু পাওয়া যাবে, সেগুলো যেমন সত্য, গোলাপটীকে সমগ্রভাবে নিলে তার যে একটা বিশেষ মাধুর্য্য আছে সেটাও তেমনি—হয়তো বা তার চাইতে বড়ো—সত্য।

তেম্নি আমাদের প্রেমের অনুভূতির আড়ালে আমাদের অর্ধচেতন মনে যত কিছুই থাক না কেন, ঐ অনুভূতির যে একটা নিজস্ব মাধুর্য্য আছে সব কিছু ছাপিয়ে, সেটা অস্বীকার করব কেন?"

এবার অন্যদিক দিয়েও ব্যাপারটাকে বিচার করে' দেখা যাক। আমি যা আছি তার জন্য যে আমাকে ভালোবাসে, আমি যা নই তা হলেও সে আমাকে তেম্নি ভালোই বাসতো কিনা তা নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামানো কেন? রবিবাবু যদি বলতেন 'আমার প্রতিভা আছে বলেই না আমায় এত সম্মান দিচ্ছ! আমি প্রতিভাহীন হলে এ সম্মান তোমরা আমায় দিতে কি?' তাহলে সেটা কেমনতরো হতো? অণিমা নরম সুরে বললো "এত কথা তো আমি ভেবে দেখিনি অরুণ।"

"অনর্থক কষ্ট পেয়েছো মনে মনে সেইজন্যেই তো।" অরুণ বল্‌ল। "জীবনের মাধুর্য্য আস্বাদন করতে হলে সব কিছু তলিয়ে দেখলে তো চলবে না। তলিয়ে শুধু তলের

রূপটাই দেখা যায়—ওপরেরও যে একটা নিজস্ব রূপ আছে সেটা দেখা যায় না; অথচ সেটাও কিছু কম সত্যি নয়। সাবানের ফেনা দিয়ে ছেলেবেলা বুদ্বুদ তৈরী করে' তাতে কত রঙের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তলিয়ে দেখিতে গেলেই রঙের খেলা যার ওপর সেই বুদ্বুদটী হাওয়ায় মিলিয়ে যেতো। তাই বলে' কি বুদ্বুদের ওপরকার বর্ণচ্ছটার রূপকে অলীক বলে উড়িয়ে দিতে হবে?"

"প্রেমকে কি তুমি তাহলে ঐ বর্ণচ্ছটার পর্য্যায়ে ফেলতে চাও অরুণ?"

"ঠিক অতদূর যেতে চাই না অবশ্য। শুধু ব্যাপারটাকে পরিষ্কার কর্‌বার জন্য একটু অতিরঞ্জন দরকার হলো। এ কথাটা তোমায় বোঝাতে চাই যে প্রেম জিনিষটা কল্পনা-প্রধান; কল্পনাই এর প্রাণ, দার্শনিক বিচার নয়। মানবীকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন একটী অত্যন্ত খাঁটী কথা—'অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।' কবি বিভাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "তুমি ও আমি-র মধ্যে যেটুকু ফাঁকা, সেই ফাঁকাটুকু ফাঁকি দিয়ে ভরে' সেই ফাঁকি ভুলে' থাকা—এরি নাম হোলো প্রেম।" এখানে কবি ফাঁকি কথাটা ব্যবহার করেছেন কল্পনা অর্থে। তথাকথিত বাস্তববাদী যারা তারা কল্পনা জিনিষটাকে সহজে আমল দিতে চান না; কিন্তু আমার মনে হয় কল্পনার মতো শক্তিমান জগতে আর কিছু নেই। আমার এক ইংরেজ

বন্ধু বল্‌তেন : Dreams of to-day are the realities of to-morrow !"

দেখা গেল অণিমা একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছে। "সেইজন্যেই"—একটু থেমে নিয়ে অরুণ আবার বলতে লাগ্‌লো, "কেউ যদি বলে প্রেম শুধু কল্পনা মাত্র তখন তার সঙ্গে এটুকু যোগ করে' দিও যে কল্‌পনার মতো দামী জিনিষ দুনিয়ায় আর নেই। 'হায়রে, প্রেম শুধুই কল্‌পনা বলে' পা ছড়িয়ে কাঁদতে বোসো না।"

এইবার অণিমা দস্তুরমতো হেসে ফেল্‌লো। সে হাসির পরে আর তত্ত্বালোচনা চলে না। সুতরাং অরুণ বল্‌লো "আমাদের আংটী দুটো তাহলে যে যেখানে আছে সেইখানেই থাক। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। চলো একটু বেড়িয়ে আসি। আলোচনার যা বাকী রইলো তা বরং আরেকদিন পুরিয়ে দেওয়া যাবে।"

অণিমা বল্ল "চলো।"

সিঁদুর

ভোরবেলা। তপোবনের নৈঋত-কোণে একটি নিম্ববৃক্ষের তলায় একটি বেদীর—অর্থাৎ মাটীর ঢিপির—উপর বসিয়া মহর্ষি খালিত দাঁতন করিতেছিলেন। এ হেন সময়ে জনৈকা তরুণী আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "প্রভু, আমি আপনার তপোবনে আশ্রয়-প্রার্থিনী।"

খালিত দাঁতন করিতে করিতেই অম্লান বদনে কহিলেন, "বেশ তো।" কহিয়া অম্লান বদনেই দাঁতন করিতে থাকিলেন; আর কিছু কহিবেন বা করিবেন বলিয়া মনে হইল না।

অবশেষে চিন্তিতা হইয়া তরুণী কহিল, "প্রভু, আশ্রয় পাইব কি?"

"নিশ্চয়ই পাইবে" বলিয়া মহর্ষি আবার অম্লান বদনে দাঁতন করিতে লাগিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া তরুণী ঈষৎ ব্যতিব্যস্তা হইয়া কহিল, "প্রভু, দীনার ধৃষ্টতা হইলে মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু আমার মনে হইতেছে আপনি আমাকে সম্যক্‌রূপে খেয়াল করিতেছেন না। বোধ হইতেছে আপনি কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, আমি আসিয়া আপনার চিন্তার বিঘ্নস্বরূপা হইতেছি মাত্র। অন্য সময় হইলে, এবং আপনি মহর্ষি খালিত না হইয়া অন্য কেহ হইলে আমি সম্ভবতঃ ক্রোধ পূর্ব্বক চলিয়া যাইতাম।

কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আপনার আশ্রয় আমার একান্তই প্রয়োজন বলিয়াই আমি—"

এইবার মহর্ষির যেন সহসা স্বপ্নভঙ্গ হইল। এতক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে কথা কহিতেছিলেন। এইবার হাতের দাঁতন হাতেই রাখিয়া তরুণীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "বৎস, কি কহিলে আবার কহ। ছি ছি! এতক্ষণ তুমি দণ্ডায়মানা হইয়া আছ, অথচ আমি খেয়ালই করি নাই। এই বেদীতেই উপবেশন কর এবং তোমার বক্তব্য বল। দেখ, এই বেদীটি অতি পবিত্র। প্রতি প্রাতে ইহারই উপর উপবেশন করিয়া আমি এই নিমগাছেরই অংশ-বিশেষের সাহায্যে দাঁতন করিয়া থাকি। বৎসে, দাঁতন করা অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য বলিয়া জানিবে। চিত্তশুদ্ধির অন্যতম সোপান দন্তশুদ্ধি। দন্ত অপরিষ্কৃত থাকিলে তদ্দ্বারা চর্ব্বিত ভক্ষ্যদ্রব্যও অপরিষ্কৃত হইবে; অপবিত্র আহার দেহের বিকার ঘটাইয়া ক্রমে মনেরও বিকার ঘটাইবে। বাহিরের সহিত ভিতরের এবং দেহের সহিত মনের যে কি নিকট সম্বন্ধ, তাহা তোমাকে একদা অবসর মত বুঝাইয়া বলিব। বর্ত্তমানে তোমার বক্তব্য বল, আমি শ্রবণ করি।"

তরুণীর ইতিমধ্যে মহর্ষির অনতিদূরে বেদীতে উপবেশন করিয়াছিল। সে বলিল, "প্রভু, আমার নাম বেপথুমতী। আমার অন্য পরিচয় বর্ত্তমানে আমি দিতে ইচ্ছা করি না, যথাসময়ে পাইবেন।"

মহর্ষি খালিত মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "বৎসে বেপথু, তোমার শুধু অন্য পরিচয় কেন, নাড়ী-নক্ষত্র পর্য্যন্ত ইচ্ছা করিলে আমার অলৌকিক ক্ষমতাবলে আমি এই মুহূর্ত্তে জানিতে পারি। কিন্তু সে ক্ষমতা আমি এ পর্য্যন্ত কখনো ব্যবহার করি নাই, এক্ষণেও করিব না। কেন না আমার মনে হয় লোক হইয়া অলৌকিক ক্ষমতা ব্যবহার করা আমার পক্ষে শোভন হইবে না। তোমার পরিচয় গোপন রাখিতে চাও রাখ, সে সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নাই। অপরিচিতা-রূপেই তোমাকে আমার তপোবনে আশ্রয় দিব।"

শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বেপথুমতী কহিল, "প্রভু, আমি কোনও কারণে গৃহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি। কিছু দিন আপনার আশ্রয়ে অজ্ঞাতবাস করিতে চাই"

শুনিয়া মহর্ষি খালিতের দুইটী চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "বৎসে, আজ প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ হইল আমার সহধর্ম্মিণী একমাত্র কন্যা চিকীর্ষাকে আমার কাছে রাখিয়া ওপারে রওনা হইয়া গিয়াছেন। ভাগ্যে আমার দূর-সম্পর্কীয়া জনৈকা পিতৃস্বসা ছিলেন, সেই বৃদ্ধাই আমার শিশু কন্যাটিকে লালন করিয়াছিলেন। চিকীর্ষা আমাকে এবং আমার বৃদ্ধা পিতৃস্বসাকে কাঁদাইয়া কিছু দিন হইল স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে। তুমি যত দিন ইচ্ছা আমার স্বামীগৃহগতা কন্যার শূন্যস্থান পূর্ণ কর। বৃদ্ধাও তোমাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইবেন। তিনি একটু বহুভাষিণী,

তাঁহার বহুভাষণ সহ্য করিয়া নিও। আরেকটি অনুরোধ, আমার তপোবনের ঐ দিকের যে অংশটি দেখিতেছ, ওই অংশে আমার অধ্যাপনা বিভাগ। সেখানে আমার তপোবনবাসী চারি জন ছাত্রকে আমি শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিয়া থাকি। তাহাদের এখন চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম চলিতেছে। তোমাকে দেখিলে তাহারা পরবর্ত্তী আশ্রমটির জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতে পারে। তাহা আমার পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, কেন না ছাত্র বর্ত্তমানে যেরূপ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে একটি ছাত্রও হাতছাড়া হইলে তাহার শূন্যস্থান পূর্ণ সহজে হয় না। অতএব বৎসে বেপথুমতি, তুমি আমার তপোবনের এই দিকের এই মহিলা বিভাগেই নিজেকে গোপন রাখিও। আমার ছাত্রবৃন্দের দৃষ্টিপথে ভুলক্রমেও আসিয়া তাহাদের চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ ঘটাইও না।"

সুন্দরী বেপথুমতীর অধরে রহস্যময়ী মৃদু হাসি ক্রীড়া করিয়া গেল। সে কহিল, "প্রভু, আমি সে চেষ্টাই করিব।" শুনিয়া বিধাতা পুরুষ সম্ভবতঃ অলক্ষ্যে মৃদু হাস্য করিলেন। মহর্ষি খালিত মনে করিলেন তিনি সমস্তই বুঝিলেন; তিনি বাস্তবিক বুঝিলেন কিনা বিধাতাই বুঝিলেন।

বেপথুমতী মহর্ষি খালিতের পিতৃস্বসা গান্ধারী দেবীর হেফাজতে আশ্রয় পাইল। চিকীর্ষা স্বামীর গৃহে চলিয়া যাইবার পর হইতেই গান্ধারী দেবী বিষণ্ণা হইয়া ছিলেন। এইবার বেপথুমতীকে পাইয়া তিনি পরম আনন্দিতা হইয়া

উঠিলেন। খালিতের ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ জানিতেও পারিল না যে তাহারা যে তপোবনে কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতেছে তাহারি নৈঋত-কোণে অতুলনীয় লাবণ্যময়ী তরুণী বেপথুমতী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

এক দিন মহর্ষি খালিত স্থির করিলেন ছাত্রবৃন্দ সহ নদীর ওপারে বৈকালে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া ফিরিবার সময় কিছু উত্তম ফলমূল লইয়া আসিবেন; তিন জন ছাত্র তাঁহার সঙ্গে চলিল। চতুর্থ ছাত্র ক্ষপণকের শরীর খারাপ লাগায় সে তপোবনেই রহিয়া গেল।

তখনও গোধূলি লগ্ন আসিতে বিলম্ব আছে, যদিও আকাশে নির্জলা স্বচ্ছ শ্বেত মেঘখণ্ড ছড়াইয়া থাকায় সূর্য্যতেজ ম্লান। গান্ধারী দেবী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তপোবনের যে-দিক্‌টাতে ব্রহ্মচর্য্য-বিভাগ, সে-দিক্‌টা দেখিবার গভীর আগ্রহ ছিল বেপথুমতীর মনে। এখন তাঁহার মনে হইল, এ হেন সুযোগ হয়তো আর কখনো পাওয়া যাইবে না। ছাত্রগণ সকলেই গুরুর সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, অধ্যাপনা বিভাগ জনহীন—এই তো সুযোগ। এ দিকে ক্ষপণক বেচারী যে সহসা শরীর খারাপ হইয়া—ধন্য শরীর খারাপ!—তপোবনেই রহিয়া গিয়াছে তাহা বেপথুমতী জানে না। অন্তত জানিবার কথা নহে, কারণ মহর্ষি খালিত গান্ধারী দেবীকে ডাকিয়া বেপথুমতীর সম্মুখেই কহিয়াছিলেন তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব

ঘটিতে পারে, কেন না ছাত্রবৃন্দ সমভিব্যাহারে তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেছেন।

তপোবনের ঐদিক এবং এই দিকের মাঝখানে একটা উঁচু বেড়া; বেড়ার মাঝখানে একটা ঝাপ দরজা, তাহাতে খিল লাগাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেই ঝাপ-দরজা ঠেলিয়া বেপথুমতী ওদিকে গেল। গিয়া দেখিল সে যেন এক আলাদা জগৎ। বাগানে ফুলগাছ আছে, কিন্তু ফুল নাই, পাতাগুলি সমস্ত শুষ্ক অথবা শুষ্কপ্রায়। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় গাছগুলিতে কদাচিৎ জল দেওয়া হয়।

একটি কুটীরের বারান্দায় অর্দ্ধচক্রাকারে সজ্জিত চারটি কুশাসন, প্রত্যেকটি কুশাসনের সম্মুখে একটি কাঠের তৈয়ারী গ্রন্থাধার, তাহার উপর শাস্ত্রগ্রন্থাদি এলোমেলো ভাবে সাজানো। মাঝামাঝি জায়গায় একটি কাষ্ঠাসন পাতা রহিয়াছে; বোঝা গেল, আচার্য্য খালিত অধ্যাপনার সময় উহারই উপর উপবিষ্ট থাকেন।

শাস্ত্রগ্রন্থগুলির প্রতি বেপথুমতীর তীব্র কৌতূহল হইল। ইহা কি জিনিষ, ইহাদের ভিতর কি লেখা থাকে, তাহা তাহার জানা ছিল না। সে কাষ্ঠাসনের মুখামুখী অবস্থিত কুশাসনটির উপর শিষ্যের ভঙ্গীতে উপবিষ্টা হইয়া সম্মুখের গ্রন্থাধার হইতে একটি গ্রন্থ তুলিয়া লইল। নারী সম্বন্ধে পুরুষকে কত রকমে সাবধান হইতে হইবে, তাহারই বিস্তৃত বর্ণনায় গ্রন্থটি পরিপূর্ণ। দেখিয়া বেপথুমতীর বড় আমোদ অনুভব হইল। সে

মনোযোগের সহিত "ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা"র পৃষ্ঠা উল্‌টাইতে লাগিল।

প্রথমে দেখিল, ব্রহ্মচর্য্য-সাধকের পক্ষে ভোজন-সংযম অত্যাবশক, এই সংযমের পক্ষে নিম্বপত্র ভক্ষণ অতীব সহায়ক। অদূরবর্ত্তী নিম্ববৃক্ষটি প্রায় পত্রহীন কেন, তাহা এইবার বেপথুমতীর নিকটে আর রহস্য রহিল না। তার পর দেখিল, ব্রহ্মচারী যথাসম্ভব স্বল্প আহার করিবে; মিষ্ট, ঝাল, টক, লবণ ইত্যাদি যত কম খাইবে ব্রহ্মচর্য্য তত বেশী জোরালো হইবে। মাথার চুলে তৈল প্রদান এবং দর্পণে মুখ-দর্শন করা চলিবে না; কারণ, তাহাতে অহমিকা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

তার পর দেখিল, নারীই ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে চরম বিপদ্-স্বরূপা, ইহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতে হইবে; দর্শন, শ্রবণ, রসনা, চিন্তা প্রভৃতিকে নারীজাতির দিকে পিছন ফিরাইয়া রাখিতে হইবে। নারীর দিকে তাকানোই নিষেধ; নেহাৎ তাকাইতেই হইলে তাকাইতে হইবে পায়ের দিকে। পড়িতে পড়িতে শেষকালে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বেপথুমতী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ক্ষপণক কুটীরের ভিতরে ইষ্টকের উপাধানে মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল। সহসা মধুর নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত হাস্যধ্বনি শুনিয়া পরম বিস্ময়ে এবং পরম আনন্দে বাহির হইয়া আসিয়া কিছুক্ষণ নিজের দেহে চিমটি কাটিয়া দেখিল, ব্যথা লাগে কি

না। দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব করিয়া চমকিতা বেপথুমতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আপনি…"

বিমুগ্ধ ক্ষপণক কহিল, "আমি ক্ষপণক। মহর্ষি খালিতের অন্যতম ছাত্র। আপনি…"

বেপথুমতী কহিল, "আমি বেপথুমতী। আজ সপ্তাহ দুই হইল মহর্ষি খালিতের তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। কি আশ্চর্য্য! আপনি মহর্ষির সহিত ভ্রমণে গমন করেন নাই দেখিতেছি।"

ক্ষপণক মনে মনে কহিল, "ভাগ্য-দেবতাকে ধন্যবাদ।" মুখে কহিল, "হঠাৎ ঈষৎ জ্বরবোধ হওয়ায় রহিয়া গিয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনি এত দিন এ তপোবনে আছেন অথচ একটি দিনের তরেও জানিতে পারি নাই!

মৃদু হাসিয়া বেপথুমতী কহিল "জানিবার তো কথা নয়। ও কি! আপনি আমার মুখের দিকে তাকাইতেছেন যে! নেহাৎ যদি তাকাইতেই হয় তো পায়ের দিকে তাকান। অশাস্ত্রীয় কাজ করিতেছেন কেন?"

নিম্বপত্র-ভোজী ব্রহ্মচারী ক্ষপণক সহসা মধু-জিহ্ব হইয়া উঠিল। কহিল, "ভগবান্ আপনাকে যে ঐশ্বর্য্য উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে না তাকাইয়া, হে দেবি, আমি তাহার অমর্য্যাদা করিতে পারিলাম না।"

পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি হয় তো ছিল—যাহার মুখে এই জাতীয় কথা শুনিলে বেপথুমতী পুলকে উচ্ছ্বসিতা হইয়া

উঠিত। তেমন ব্যক্তি ক্ষপণক হয় তো হইতেও পারিত, কিন্তু কয়েক বৎসর ব্যাপী শাস্ত্রীয় সাধনা এবং বহু নিম্বপত্রভক্ষণের ফলে এখনও ক্ষপণক তেমন ব্যক্তি নহে। সুতরাং উচ্ছ্বসিতা না হইয়াই বেপথুমতী সহজ ভাবে কহিল, "অনর্থক এরূপ প্রশংসা করিবেন না। আপনার মুখে শোভা পায় না।"

কথাটার অর্থ ক্ষপণক কি বুঝিল সেই জানে। কবিত্ব করিয়া কহিল, "অতি যথার্থ কহিয়াছেন। যাহাকে প্রশংসা করিবার ভাষা নাই, ভাষার সাহায্যে তাহাকে প্রশংসা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। দেবি, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।"

ক্ষপণকের কথার প্রতি মনোযোগ না দিয়া বেপথুমতী কহিল, "ছি ছি! কি ভুলই করিলাম। আপনাদের এদিকে আসা মহর্ষি খালিতের এক-রকম নিষেধই ছিল।"

"কিন্তু বিধাতার নিষেধ ছিল না।" ক্ষপণক কহিল।

বেপথুমতী কহিল, "এইবার আমি যাই। গান্ধারী পিসী কখন জাগিয়া উঠিবেন কিছু ঠিক নাই। আপনারা কেহ নাই জানিয়াই এদিকে আসিয়াছিলম। আপনি আছেন জানিলে আসিতাম না।"

ক্ষপণকের তখন মাথার ঠিক ছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, এই নারী ছলনা করিয়া মিথ্যা কহিতেছে। কি একটা কথা বলি বলি করিয়াও ক্ষপণক না বলিয়া থামিয়া গেল। মন বলিল, রে মূর্খ, সে কথা এখনো নহে।

বেপথুমতী কহিল, "আমি যে আসিয়াছিলাম, সে কথা কেহ যেন না জানে।"

ক্ষপণক কহিল, "কেহ জানিবে না।"

বেপথুমতী বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, ক্ষপণক মুগ্ধনেত্রে বিদায় দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে কি যেন একটা স্থির করিল।

রাত্রি আরম্ভ হইবার কিছু পরেই বাকী শিষ্যসহ মহর্ষি খালিত তপোবনে ফিরিলেন। মহর্ষি গেলেন নিজ ভবনে, শিষ্যগণ গেল তাহাদের নিজ বিভাগে। কুটীরে প্রবেশ করিতে করিতে তাহারা শুনিতে পাইল, ক্ষপণক গুন্‌-গুন্‌ করিয়া গান গাহিতেছে। শুনিয়া অবাক্ হইল। তাহারা জীবনে কখনও ক্ষপণককে গান গাহিতে শোনে নাই; ভাবিল, জ্বরে হয় তো বা তাহার চিত্তবিকার ঘটিয়াছে।

ক্ষপণকের চিত্তবিকার ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু জ্বরে নহে। তাহার মনে হইতেছিল, এত দিন মহর্ষি খালিত যে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন তাহা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সত্য নাই। পরক্ষণেই আবার তাহার মনে হইতেছিল, "ছি ছি! এ কি পাপ চিন্তা করিতেছি?" দোটানায় পড়িয়া তাহার মন হয়রাণ হইয়া উঠিল।

ভরদ্বাজ, কপিল ও উদ্দালক ক্ষপণকের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া কহিল, "তোমার দেহ কি অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হইতেছে ক্ষপণক?"

ক্ষপণক কহিল, "না। আমি আজ এক নূতন চিন্তাধারার আঘাতে জর্জ্জর বোধ করিতেছি আমার মনে হইতেছে, আমরা এই আশ্রমে এত দিন যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা ভুল।"

শুনিয়া তিন জন শ্রোতাই এক-সঙ্গে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল, "মহর্ষি খালিত আমাদিগকে ভুল শিক্ষা দিয়াছেন? তুমি কি পাগল হইয়াছ ক্ষপণক?"

"পাগল হই নাই। অথবা এক হিসাবে হইয়াছিও বলিতে পার। আজ আমার চোখ খুলিয়া গিয়াছে। দেখ, ফুলের শোভা যদি উপভোগ না করিব তাহা হইলে ভগবান্ ফুলের সৃষ্টি করিয়াছেন কেন? দেহে ও মস্তকে যদি তৈল না দিব তাহা হইলে নারিকেল, তিল ও সরিষাকে ভগবান্ নিস্তৈল করিয়া সৃষ্টি করিলেন না কেন? পৃথিবীতে এত বিচিত্র রকমের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় থাকিতে নিম্বপত্র ভক্ষণ করিয়া মরিব কেন?"

ভরদ্বাজ, কপিল ও উদ্দালক ক্ষপণকের উত্তেজনা দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। মহর্ষি খালিতের শিষ্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্ষপণকই ছিল শ্রেষ্ঠ। সে যেরূপ কঠোর ভাবে সংযম সাধনা করিত তাহাকে হঠযোগ সাধন বলিলেই চলিত। হঠাৎ সে এরূপ উল্টা গাহিতেছে কেন? নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ ঘটিয়াছে।

ভরদ্বাজ কহিল, "শোন ক্ষপণক। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত তোমার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই তোমার কানে

শুনাইতেছি। পৃথিবীতে নানা রকম ভোগের উপকরণ ছড়াইয়া রাখিয়া ভগবান্ মানুষকে পরীক্ষা করিতেছেন মাত্র। ভোগের প্রলোভনে নিজেকে এলাইয়া দেওয়া অতি সহজ; সে ব্যাপারে মানুষ পশুর সমতুল্য। কিন্তু সকল প্রকার ভোগের প্রলোভন জয় করিয়া যে আত্ম-সংযম, ব্রহ্মচর্য্যের যাহা আদর্শ, তাহাতে মানুষ দেবতাদের সমতুল্য হইয়া উঠে।"

শুনিয়া ক্ষপণক কহিল, "অর্থাৎ তুমি বলিতে চাও দেবতাদের আদর্শ অনুকরণ বা অনুসরণই মানুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয়?"

ভরদ্বাজ মাথা নাড়িল।

ক্ষপণক হাস্য করিয়া কহিল, "তবেই দেখ, এত দিন আমরা ভুল পথে চলিয়া আসিয়াছি। দেবতাদের সংযমের কোন বালাই নাই। স্বর্গের নন্দন কাননে রূপসী অপ্সরাদের নৃত্য তাঁহাদের নিকট কখনো পুরাতন হয় না, তাই মেনকা, উর্ব্বশী, রম্ভা, ঘৃতাচী ইহাদের মধ্যে কেহ না কেহ নৃত্য করিতেছেই। এমন কি, বেচারী বেহুলা যখন স্বামী লক্ষীন্দরের প্রাণ ফিরিয়া পাইবার জন্য স্বর্গে গিয়াছিল, দেবতারা তাহাকে পর্য্যন্ত নাচাইয়া ছাড়িয়াছিলেন; দুঃখিনী বলিয়া রেহাই দেন নাই। তাছাড়াও দেবতাদের আরো যে কত রকমের লীলা-খেলা—"

কপিল দেখিল গতিক বড় ভাল নয়। এই বেলা থামাইয়া দেওয়া দরকার। কহিল "দেখ, দেবতাদের লইয়া অনর্থক

টানাটানি করার দরকার কি? আমাদের আদর্শ মহর্ষি খালিত।”

ক্ষপণক কহিল, “আমিও তো ঠিক তাহাই বলি। তাঁহার আদর্শ আমরা পালন করিলাম কোথায়? তিনি যে আমাদের মত নিম্বপত্র ভক্ষণ তো দূরের কথা, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের প্রতি আমাদের শতাংশের একাংশ অনাদরও দেখান নাই, তাঁহার নধর বপুটিই তাহার প্রমাণ দিতেছে। তাঁহার দুহিতা চিকীর্ষাকে তোমরা সকলেই দেখিয়াছ; তাহার জননী অপরূপা সুন্দরী ছিলেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অথচ আমাদের বেলায় মহর্ষি খালিত বলিতেছেন—”

উদ্দালক কহিল, “দোহাই তোমার, ক্ষান্ত হও ক্ষপণক। তুমি আজ প্রকৃতিস্থ নহ। বর্ত্তমানে এ আলোচনা বন্ধ থাকুক।’

আলোচনা আর অগ্রসর হইল না বটে, কিন্তু সকলেরই মনে কেমন একটা দোলা লাগিয়া রহিল।

সে-দিন গভীর রাত্রে ঘুমন্ত ক্ষপণকের উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া তাহার তিনটি সতীর্থেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তাহারা প্রত্যেকেই ঘুমের ভাণ করিয়া সমস্তই শুনিল। উদ্দালক ভাবিল কপিল ও উদ্দালক ঘুমাইতেছে, কপিল ভাবিল উদ্দালক ও ভরদ্বাজ ঘুমাইতেছে এবং প্রত্যেকেই ক্ষপণকের ঘুমের ঘোরে বক্তৃতা শুনিয়া জানিতে পারিল, অতুলনীয়া সুন্দরী বেপথুমতী মহর্ষি খালিতের তপোবনেই

গান্ধারী পিসীর আশ্রয়ে বাস করিতেছে এবং ক্ষপণকের চিত্ত তাহারই রাতুল চরণ-পদ্মে লুটাইতেছে। ফলে তাহাদের তিন জনের চিত্তেরও ঐ অবস্থাই হইল, এবং তাহারা প্রত্যেকই গোপনে গোপনে বেপথুমতীর দর্শন-কামনায় আকুল হইয়া রহিল।

"ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়" প্রবাদটি সব সময় সত্য না হইলেও ইহাদের বেলায় সত্য হইল। ইহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একে অন্যকে না জানাইয়া অতি গোপনে বেপথুমতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং ভাবিতে লাগিল বেপথুমতী বিহনে এ জগতে বাঁচিয়া কোন লাভ নাই, অতএব বাঁচা যাহাতে লাভজনক হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেকেরই মন বেপথুমতীতে ভরিয়া উঠিল। উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে তাহারা বেপথুমতীর কথাই ভাবিতে লাগিল। ও-দিকে বেপথুমতী কিন্তু এ সকলের কিছুই জানে না, অথবা জানিয়াও না জানিবার ভাণ করে।

পাঠক-পাঠিকা সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে মহর্ষি খালিতের ছাত্র-চতুষ্টয়ের অবস্থা মনে মনে মক্স করিয়া নিতে পারিয়াছেন। ক্ষপণকের ধারণা বেপথুমতীর তপোবনে উপস্থিতির কথা এবং বেপথুমতীর প্রতি ক্ষপণকের মনোভাবের কথা তাহার তিন সতীর্থের মধ্যে কেহই জানে না। বাকী তিন জনের প্রত্যেকের ধারণাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় "ক্ষপণক বেপথুমতীর প্রেমে উন্মাদ। হায়, সে জানে না,

আমিও যে তাহারই মত প্রেমের দহনে দহিতেছি। বাকী দুই বন্ধুই ভাল আছে, তাহারা বেপথুমতীর কথা জানে না। আহা আমিও যদি বেপথুমতীকে না জানিতাম না দেখিতাম! না না, সে দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তাও করা যায় না। এই দহনেও যে আনন্দ আছে।"

ক্ষপণক এক দিন বেড়াইতে বাহির হইয়া কোথা হইতে দর্পণ, চিরুণী, কেশতৈল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং তিনটিরই ব্যবহার সুরু করিল। বাকী তিন জন যে যাহার নিজের মনে ব্যাপারটা বুঝিয়াও না বোঝার ভাণ করিয়া কহিল, "ও কি ক্ষপণক?"

ক্ষপণকের ধারণা ছিল, আসল ব্যাপারটা ইহারা কেহই জানে না। কহিল, "সে-দিন যাহা বলিয়াছি তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন দেখি না।" কহিয়া তাহার নূতন আদর্শ পালন করিতে লাগিল। ভরদ্বাজ, উদ্দালক এবং কপিলও ক্ষপণকের আদর্শ অনুকরণ করিল।

ও-দিকে তখন মহর্ষি খালিতের মৌনব্রতের সপ্তাহ সুরু হইয়াছে। বৎসরের মধ্যে এই একটি সপ্তাহ তিনি একা থাকেন, বাহির হন না, কাহাকেও দেখা দেন না, কাহারও সহিত কথা বলেন না, এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন অভ্যাস করিয়া থাকেন। কাজেই তাঁহার অধ্যাপনা বিভাগে যে কি আমূল পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। সপ্তাহ শেষে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া তিনি

যে কি মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন তাহা কহতব্য নহে। তিনি দেখিলেন, কাহারো মাথায় রুক্ষ জট্-পাকানো চুল নাই, প্রত্যেকেরই মাথার বাম-অংশে ললাটের উপরিভাগ হইতে সুরু করিয়া একটি সরল সরু পথ পিছন দিকে চলিয়া গিয়াছে, এবং এই পথের দুই ধারে তৈল-চিক্কণ কালো চুল সুবিন্যস্ত ভাবে শায়িত রহিয়াছে। প্রত্যেকেরই চেহারা দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, ইহারা স্নানের সময় সযত্নে প্রচুর পরিমাণে সরিষার তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়াছে, এবং ইহাদের আহার্য্য-তালিকায় নিম্বপত্র বাদ পড়িয়া প্রচুর গব্য এবং অন্যান্য প্রকার উপাদেয় দ্রব্য যুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ এক কথায় ত্যাগ-সাধনার পথ হইতে এই সাত দিনের মধ্যেই তাহারা ভোগ-সাধনার পথে বহু দূর দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। দেখিয়া মহর্ষি খালিত ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া কহিলেন, "ক্ষপণক!"

পূর্ব্বে হইলে গুরুদেবের এই হুঙ্কারে পরম-বিনীত শ্রদ্ধাবান্ ছাত্র ক্ষপণক ত্রস্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু বেপথুমতীর স্বপ্নে মশ্‌গুল্ হওয়ার পর হইতে সে অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছে। পরম শান্ত কণ্ঠে সে কহিল, "গুরুদেব!"

গুরুদেব অগ্নিময় কণ্ঠে কহিলেন, "এ তোমরা করিয়াছ কি?"

তেমনি শান্ত কণ্ঠে ক্ষপণক জবাব দিল, "গুরুদেব, ঠিকই করিয়াছি।"

মহর্ষি খালিত কহিলেন, "এত দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক বৃথাই তোমাদিগকে শাস্ত্র শিক্ষা দিলাম।"

ক্ষপণক সবিনয়ে কহিল, "গুরুদেব, যথার্থই কহিয়াছেন।"

মনের যে চরম অবস্থায় পরম বিনয়কে পরম ধৃষ্টতা মনে হয়, মহর্ষি খালিত তখন সেই অবস্থাতেই অবস্থিত ছিলেন। তিনি ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, "এই মুহূর্ত্তে তোমরা আমার তপোবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হও। তোমাদের মত ছাত্রের আমার প্রয়োজন নাই।"

ছাত্রেরা এমন ভাবে গুরুদেবের চরণধূলি দ্রুতবেগে শিরোধার্য্য করিয়া তপোবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল যেন এই পরম মুহূর্ত্তটির জন্যই বহু দিন ধরিয়া তাহারা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াছিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে ক্রোধের উপশম হইলে মহর্ষি খালিত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইতে কহিতে লাগিলেন, "হায়, এ কি করিলাম! মুহূর্ত্তের তরে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া চিরতরে ছাত্রহারা হইলাম! আর কি তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে? আর কি তাহাদের শূন্যস্থান পূর্ণ হইবে? না হয় তাহারা বালসুলভ সারল্যবশতঃ কিঞ্চিৎ ধৃষ্টতা করিয়াই ছিল, কিন্তু কেন আমি গুরুসুলভ ঔদার্য্যের সহিত তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিলাম না? জগতে শুদ্ধমাত্র সুমতিই যদি থাকিত তাহা হইলে গুরুর কোন প্রয়োজন থাকিত না, দুর্ম্মতি আছে বলিয়াই, তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য গুরুর প্রয়োজন। হায়, আমার অবোধ ছাত্রগণ যখন দুর্ম্মতির বশীভূত, তাহাদের সেই চরম প্রয়োজনের কালেই আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলাম? হে জগদীশ্বর! হে বিশ্বপাতা! তোমার

শ্রীচরণকমলযুগল ধ্যানযোগে স্পর্শ করিয়া আমি নতমস্তকে স্বীকার করিতেছি আমি আর মহর্ষি নামের যোগ্য নহি, আমি আজ হইতে মহামূর্খ খালিত।" কিন্তু মহামূর্খ খালিতের মন ছাত্রদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ছুটিলেও মহামূর্খ খালিত স্বয়ং তাহা পারিলেন না; আত্মাভিমানে বাধিল।

ও-দিকে ছাত্রেরাও উত্তেজনার বশে তপোবন ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াই প্রত্যেকে মনে মনে নিম্নলিখিতরূপ চিন্তা করিতে লাগিল:

"হায় হায়, এ কি করিলাম! মুহূর্তের অভিমানে আত্মহারা হইয়া প্রাণপ্রতিমা বেপথুমতীর সান্নিধ্যহারা হইলাম! আর কি গুরুদেব ডাকিয়া লইবেন? আর কি বেপথুমতীর সান্নিধ্য লাভ করিব? অহো, 'ব্রহ্মচর্য-সাধনা' গ্রন্থোক্ত ক্রোধ-উপশমের এক হইতে বিংশতি পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে গণনার কৌশলটি অবলম্বন না করিয়া কি ভুলই করিয়াছি! বাহির হইয়া আসার পূর্ব্বে ঐরূপ গণনা আরম্ভ করিলে সম্ভবতঃ বিংশতি পর্য্যন্ত পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই ক্রোধ শীতল হইয়া আসিত এবং গুরু-দেবের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া তপোবনেই রহিয়া যাইতাম। হায়, এক্ষণে আর কোন্ মুখে তপোবনে ফিরিয়া যাইব?" তাহাদের প্রত্যেকেরই মন অনুতপ্ত হইয়া তপোবনে ফিরিয়া গিয়া মহর্ষি খালিতের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু তাহারা স্বয়ং তাহা পারিল না—আত্মাভিমানে বাধিল। তাহারা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল এবং প্রকৃত ঘটনা গোপন

করিয়া কহিল, তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সমাপ্ত হওয়ায় তাহারা গুরুদেবের নির্দ্দেশে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। এই সংবাদে পুলকিত হইয়া তাহাদের স্বজনগণ তাহাদিগকে গার্হস্থ্য আশ্রম স্থরু করাইবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা উত্তম উত্তম বিবাহের প্রস্তাব আনিতে লাগিলেন, কিন্তু বেমথুমতীগতপ্রাণ তরুণ চতুষ্টয় কোন না কোন অজুহাতে প্রত্যেকটি প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিতে লাগিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া তাহাদের আত্মীয়গণ হাল ছাড়িয়া দিলেন, এবং তাহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বেপথুমতী যে অন্তর জুড়িয়া রহিয়াছে সে অন্তরে অন্ম কোন নারীর স্থান-সংকুলান হইতে পারে না।

কেন বলিতে পারি না, ইহাদের প্রত্যেকেরই মনে মনে বিশ্বাস, বেপথুমতীকে স্থযোগমত প্রেম-নিবেদন করিতে পারিলেই বেপথুমতী তাহা ফেরৎ দিবে না, সানন্দে গ্রহণ করিবে। প্রত্যেকেই যথাসম্ভব গোপনে নিয়মিতভাবে মহর্ষি খালিতের তপোবনের আশে পাশে ঘুরিয়া স্থযোগের অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং নিয়মিত ভাবে ব্যর্থ হইতে লাগিল। এই ভাবে একদিন দুইদিন করিয়া অনেকগুলি দিন এক দিক্ দিয়া আসিয়া অন্ম দিক্ দিয়া চলিয়া গেল। ক্রমে চারি জনের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের মুখামুখি হইয়া গেল, এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ঐকান্তিক বেপথুমতীগতপ্রাণতা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া প্রত্যেকের মনই গোপনে কাঁদিয়া উঠিল।

তখন ক্ষপণক কহিল, "বন্ধুগণ, ইহা পরম পরিতাপের বিষয় যে বেপথুমতী মাত্র এক জন এবং আমরা চারি বন্ধুই তাহাকে প্রাণ সঁপিয়া ফেলিয়াছি। মহাভারতের যুগ বহু দিন হইল বিগত হইয়াছে, সুতরাং একা বেপথুমতীর পক্ষে আমাদের চারি জনের প্রাণ গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না; আমাদের মধ্যে তিন জনকে বিফলমনোরথ হইতেই হইবে। এক্ষণে সমস্যা হইতেছে, এই তিন জন কে কে হইবে।" বলিতে বলিতে ক্ষপণকের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

কপিল কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিল, "আইস, আমরা কোন নির্জ্জন বনে গমনপূর্ব্বক আমরণ দ্বৈরথে প্রবৃত্ত হই। শেষ পর্য্যন্ত যে একজন বাঁচিয়া থাকিবে সে-ই অতুলনীয়া বেপথুমতীকে—"

ভরদ্বাজ কহিল, "তা এক-রকম মন্দ বল নাই কপিল। কিন্তু ঐরূপ কবিলে তিন জনকে যে মরিতে হইবে।"

উদ্দালক কহিল, "বেপথুমতীকে না পাইলে জীবন রাখিয়াই বা কি লাভ হইবে?"

ক্ষপণক কহিল, "কিন্তু কপিলোক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে আমাদের চারি জনের মধ্যে কোন্ তিনজন মরিবে, তাহার কিছু স্থিরতা নাই। এমন হইতে পারে যে মৃত তিন জনের মধ্যে এক জনেরই বেপথুমতীর প্রিয়তম হইবার সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। সুতরাং বেপথুমতীর মন না জানিয়া আন্দাজে কিছু করা ঠিক হইবে না।"

কথাটা সকলের মনেই লাগিল। সুতরাং সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, লজ্জা ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি খালিতের শরণাপন্ন হইবে, এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় অতুলনীয়া বেপথুমতীর রাতুল চরণপদ্মে প্রেম-নিবেদন করিবে; চারিটির মধ্যে হইতে একটি প্রেম বেপথুমতী নিজের রুচিমত বাছিয়া লইবে।

পরদিন কল-কোকিল-কূজিত প্রভাতে মহর্ষি খালিত দাঁতন করিতেছেন, এ-হেন সময় ক্ষপণক, ভরদ্বাজ, কপিল ও উদ্দালক তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া কহিল, "গুরুদেব, আমরা আসিয়াছি। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

মহর্ষি খালিত আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "তোমাদের মার্জ্জনাভিক্ষার পূর্ব্বেই আমি মার্জ্জনা করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি জানিতাম তোমরা ফিরিয়া না আসিয়া পারিবে না।" বলিয়া তিনি যে অর্থে হাসিলেন তাহার অনুরূপ অর্থ বুঝিয়া ছাত্রগণ ভাবিল, তাহাদের প্রেম-কাহিনী মহর্ষি খালিতের অজানা নাই।

তখন ক্ষপণকই অগ্রণী হইয়া কহিল, "গুরুদেব, আমাদের চারি জনেরই এক অবস্থা। বেপথুমতীকে লাভ করিতে না পারিলে আমরা কেহই প্রাণে বাঁচিব না। সুতরাং তিন জনকে প্রাণে মরিতেই হইবে। আপনি কৃপা করিয়া বেপথুমতীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দিন, যেন—"

মহর্ষি খালিত হাতের দাঁতন হাতেই রাখিয়া কহিলেন, "কিন্তু—"

উদ্দালক কাঁদিয়া কহিল, "গুরুদেব, ইহাতে আর কিন্তু করিবেননা। আমরা আপনার সন্তান তুল্য। আমাদের অপরাধ হইয়া থাকিলে নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া নিবেন। কিন্তু—"

মহর্ষি খালিত কহিলেন, "কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে বেপথুমতীর স্বামী আসিয়া অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া বেপথুমতীকে লইয়া গিয়াছে। সে স্বামীর সহিত অভিমান করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল।"

বেপথুমতী স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে? বেপথুমতী বিবাহিতা? হায় হায়! প্রথমেই তাহা জানা থাকিলে তো কাহারও প্রাণ এত দূর অগ্রসর হইত না। মহর্ষি খালিতের চারি জন ছাত্রই নিদারুণ হতাশায় শিশিরসিক্ত তৃণদলের উপর বসিয়া পড়িয়া বালকের স্থায় রোদন করিতে লাগিল।

* * * *

কাহিনীটি এখানে শেষ করিয়া দিলেই বোধ হয় আর্ট বজায় থাকিত ভাল। কিন্তু এমন পাঠক-পাঠিকাও আছেন, যাঁহারা আর্ট অপেক্ষা তথ্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগী; তাঁহাদের খাতিরেই বিদায় নিবার পূর্ব্বে আরও খানিকটা অগ্রসর হইতে হইবে।

ক্ষপণক, কপিল, ভরদ্বাজ ও উদ্দালক অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িল, এবং আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ অধিক একাগ্র হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং মহর্ষি খালিতের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিল। যে নিম্ববৃক্ষটি কিছু দিন যাবৎ বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেছিল তাহা পুনরায় চারি জন নিম্বপত্রভোজীর জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিল।

ছাত্রদিগকে ফিরিয়া পাইয়া মহর্ষি খালিত পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাদের সদা-বিমর্ষ বদন দেখিয়া মনে গভীর বেদনা অনুভব করিতেন। ভাবিতেন, "হায়, ইহারা না বুঝিয়া প্রাণ সঁপিয়া কি নিদারুণ যাতনাই না ভোগ করিতেছে। যদি প্রথমেই জানিতে পারিত বেপথুমতীর চরণ-পদ্মে একটি প্রাণ পূর্ব্বেই স্থান দখল করিয়া বসিয়া আছে, নূতন প্রাণের আর স্থান নাই, তাহা হইলে তাহারা আর অগ্রসর হইত না। প্রথমে একটুকু ভুলের ফলে ইহারা দুঃসহ মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতেছে। অনুরূপ ভুল করিয়া ইহাদেরই মত আরও কত তরুণ প্রাণ বেদনার তুষানলে দহিবে কে জানে? অতএব বিবাহিতা রমণীর এরূপ কোন চিহ্ন ধারণ করা প্রয়োজন, যাহা দেখিলেই তাহার চরণপদ্ম হইতে কুমারগণ নিজ নিজ প্রাণ সাবধানে রাখিবে, আমার এই ছাত্র-চতুষ্টয়ের মত ভুল করিয়া পূর্ব্ব-দখলিত চরণপদ্মে প্রাণ সঁপিয়া ফেলিয়া পরে অযথা অসহ দুঃখ ভোগকরিবে না।"

বর্ত্তমানে আমাদের নারীসমাজে সঁাথিতে এবং ললাটের মধ্যস্থলে সিঁদুর-প্রয়োগের যে রীতি আছে, তাহার ইতিহাস বিশ্লেষণ করিতে করিতে গোড়া পর্য্যন্ত গেলে দেখা যাইবে যে, ইহা মহর্ষি খালিতেরই প্রচেষ্টার ফল।

পকেটমারের পত্র

[একদা একটী পকেটমার এক ভদ্রলোকের পকেট মারিয়া পরে হাতে নাতে ধরা পড়িয়া প্রথমে কিছুক্ষণ বারোয়ারী কীল খাইয়া পরে যথাক্রমে থানায়, হাজতে, বিচারালয়ে এবং সর্ব্বশেষ ছয় মাসের জন্য জেলে গিয়াছিল। জেল হইতে সে ঐ ভদ্রলোককে একটী পত্র লিখিয়াছিল। দৈবক্রমে তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মূল পত্রটী আপনাদের সকলকে দেখানো সম্ভব নয় বলিয়া নীচে তাহা কিছু কিছু কাট ছাঁট করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।]

সালাম লিবেন বাবু। আমি করিম শেখের পো কাল্লু শেখ। আপ্‌নার পকেট মার্‌তে গিয়ে লাভ তো কিছু হলোই না, উল্‌টে জেল ভি হয়ে গেল ছ মাসের। জেলের জন্তে

আমি থোড়াই পরোয়া করি, কিন্তু একটা বদ্‌নাম যে হলো, ফিরে গিয়ে দোস্তদের আর সাগ্‌রেদদের সাম্নে মুখ দেখাব কেমন্ করে’? আমি ওস্তাদের পো ওস্তাদ, কিনা একেবারে জলজ্যান্ত ধরা পড়ে গেলুম পকেটে হাতশুদ্ধ্ !

আমার বাপ করিম শেখ ছিলো পকেটমারের বাদ্‌শা। আজো তামাম কল্‌কাতার পকেটমাররা বাপ্‌জানের নাম কর্‌লেই সেলাম ঠোকে। বুড়ো বয়সেও বাপ্‌জান বাজী ধরে একবার এক জাঁদরেল পুলিশ সায়েবের পকেট বেমালুম মেরে দিলে—এ একেবারে জলজ্যান্ত চোখের সাম্নে দেখা। কোনো-দিন পকেট না মার্‌তে পার্‌লে সেদিনে ঘুম হতো না বাপ্‌জানের। বাপ্‌জান বেহেস্তে রওনা হলো যেদিন সেদিনকার কথা একেবারে পটের ছবির মতন মনে আছে বাবু। সন্ধ্যেবেলা যখন আঁধার নেমে এলো, তখন বাপ্‌জানের কি যেন হলো—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে’ তাকিয়ে ত্বহাত বাড়িয়ে যেন পকেট খুঁজে বেড়াচ্ছে। ফজ্‌লু চাচা কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাক্‌লে “ভাইসাহেব!” বাপ্‌জান ফজ্‌লু চাচার মুখের দিকে তাকিয়ে তুদিকে তুটো হাত বাড়িয়ে খুঁজ্‌তেই লাগ্‌লো কি যেন। ফজ্‌লু-চাচা বল্‌লে “কাল্লু. দেখ্ ভাই সাহেবের জান্‌টা ঠোঁটের ডগায় এসে আট্‌কে গিয়ে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। এখন পকেট না মার্‌তে পার্‌লে তো সে জান্ নিক্‌লাবে না। দে দে পকেট এগিয়ে দে।”

তখন আমার পকেট এগিয়ে দিলুম বাপ্‌জানের ডান

হাতের সাম্নে। ফজ্‌লু চাচা তার পকেট এগিয়ে দিলো বাঁ হাতের সাম্নে। দুহাতে দুজনের পকেট মেরে নিয়ে বাপ্‌জানের খাবি খাওয়া ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠ্‌লো। "ইয়া অল্লা, মার দিয়া কেল্ল।" বলে বাপ্‌জান পটল তুল্‌লো। আমি ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লুম, কেঁদে উঠ্‌লো ফজ্‌লু চাচা। পেশোয়ার থেকে এসেছিলো পেশোয়ারী পকেটমার জুল্‌ফিকার খাঁ; সেও কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বললে "অ্যায়সা সাচ্চা পাকিট্‌মার কভী নহি দেখা, শুনা ভি নহি। মর্‌নেকো বখত ভি দো হাথ্‌মে দো পাকিট্‌মার্ লিয়া।"

বাপ্‌জানের দিকে তাকিয়ে বড় জবর কান্না কাঁদ্‌লুম বাবু। বাংলায় কাদ্‌লুম, হিন্দীতে কাঁদ্‌লুম, উর্দ্দুতে কাঁদ্‌লুম। আমি যেমন, ফজ্‌লু চাচাও তেম্নিই, দুজনাই বাপ্‌জানের সাগ্‌রেদ্ কিনা! বাপ্‌জান একে আমার বাপ, চাচার ভাই, তায় ওস্তাদ—ডবল কান্নার পাওনাদার। কিন্তু তাজ্জবের বাৎ কি বল্‌বো বাবু, আমাদের ডবল কান্নাকে খোকা বানিয়ে দিলে পেশোয়ারের জুল্‌ফিকার খাঁ। সে হাউ হাউ করে কেঁদে বল্‌তেই লাগ্‌লো "অ্যায় মেহেরবান্! তুম্‌হারা বেহেস্ত্‌মে পাকিট্ হ্যায় কি নহি মুঝে নাহি মালুম্। অগর্ না রহে তো ইন্‌কো মারনেকে লিয়ে ওহাঁ ভি পাকিট্ বনা দো। অ্যায়সা সাচ্চা পাকিট্‌মার বেহেস্ত্‌ যা কর্ পাকিট্ না মার সকে তো বহোৎ পরেশান্ হোগা।" সাচ্চা বাৎ বলেছিলো জুল্‌ফিকার। সাচ্চা পকেটমার বেহেস্তে গিয়েও পকেট মারে। অ্যায়সা

বাপের লেড়্‌কা আমি কাল্লু শেখ, পকেটে হাত শুদ্ধু ধরা পড়ে গেলুম! বেহেস্তে বাপ্‌জান টের পেলে দিলে বড় জবর চোট্‌ পাবে বাবু। আর জুল্‌ফিকার খাঁ খবর পেলে বল্‌বে "অ্যায়সা ওস্তাদ পাকিট্‌মারকো অপ্‌না লেড়্‌কা অ্যায়্‌সা বেওকুফ হুয়া ক্যায়সে?"

সাচ্চা বাৎ বল্‌ছি বিশ্বাস করুন বাবু,—আপনার পকেট আমি মেরেছিলুম মেছোবাজারের মোড়ে আর ধরা পড়েছিলুম—সে তো আপ্‌নিই জানেন—হেদোর ধারে। ধরা যে পড়্‌লুম সেটা পকেট মেরে নয়। শুনুন তাহলে গোড়া থেকেই বলি। মেছোবাজার আমহাস্‌ ইস্‌টীট্‌ যেখানে দোস্তি পাতিয়েছে সেইখান থেকে আপনার পিছু ধরলুম। তারপর মোড়ের কাছাকাছি এসেই আপনার ঘেঁসে বিড়ি ফুঁকে যেতে যেতে বেমালুম পকেট মেরে দিলুম। লিয়ে স্যাঙাৎ কাঙালীচরণের পানের দোকানে গিয়ে দেখলুম। কি পাওয়া গেল। মোটে তিন টাকা সাড়ে ন' আনা, টেরাম গাড়ীর কুপন একখানা, আর একপাতা চিঠি। বুঝলুম ঐ যে কথায় বলে, বা'ইরে কোঁচার পত্তন ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন, আপনার হয়েছে তাই। শুন্‌লুম বাপজান বেহেস্ত্‌ থেকে চিল্লাচ্ছে—"খবরদার কাল্লু, তুই আমার লেড়কা আমার সাগরেদ্‌ হয়ে ঐ খুচরো লিয়ে হাত কালো করিস না। ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে।" আমি বল্‌লুম—"সব ফিরতি দেবো বাপ্‌জান, শুধু এই চিঠিখানা পড়ে লিব।" খুলে দেখলুম আপনার বিবির লেখা বাবু। পেরথোমেই একগাদা ভালো-

বাসার ফর্দ্দ লিখেছে। আমি পকেটমার মানুষ বাবু, ওসব ভালোবাসা টালোবাসা বুঝিনে, ওর ধারও ধারিনে। ওসব জানি স্রেফ ধোঁয়া—বুজরুকী। আপনাদের ভদ্দর লোকদের ও একটা আজব খেয়াল, ও যেন সখের ঠুলি চোখে লাগিয়ে থাকা। আজ যদি আপ্‌নার ইয়া গাড়ী আর ইয়া বাড়ী থাকে বাবু, তো দেখ্‌বেন আপ্‌নার বিবির ভালোবাসার ঘোড়া যেন টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ ছুটছে; আর ঐ গাড়ী আর বাড়ী নিলেমে ওঠে তো দেখ্‌বেন সাথ সাথ ঐ ভালোবাসাও নিলেমে উঠলো। পকেটমার করিমশেখের পো কাল্লু শেখ ঢের দেখেছে বাবু, ঢের জেনেছে।

ছেড়ে দিন বাবু ভালোবাসার বাৎ। তারপর দেখলুম আপনার বিবি দিয়েছে হরেকরকম জ্বালা যন্ত্রণার ফর্দ্দ—খাবার নেই, পর্‌বার কাপড় নেই, ব্যামোর দাওয়াই নেই, আরো কত কি। পড়ে ভাবলুম আহা হা, জেনানা লোক বড় জবর দুঃখু পাচ্ছে, দেবো ঐ ঠিকানায় কিছু টাকা মোনি অডর করে'। আজ তো বাবুর পকেটে এই তিন টাকা সাড়ে ন' আনা ফিরতি দিই!

হন্‌হন্‌ করে ফের আপনার পিছু নিয়ে বাবু ধরলুম এসে হেদোর পুকুরের ধারে। আপনার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলুম—হাতে সেই তিনটাকা সাড়ে ন' আনা, টেরামের কুপন, আর আপনার বিবির চিঠি বাবু। পকেট মারতে কোনদিন হাত কাঁপে নি, মারা মাল পকেটে ফিরতি দিতে

হাত কেঁপে উঠলো। আপনি টের পেয়ে খপ্ করে ধরে ফেল্‌লেন হাত, দিলেন চিৎকার, আমায় ঘিরে ফেল্‌লো এক ঝাঁক হেদোর হাওয়া খেকো ভদ্দরলোক আর ছোকরার দল। আপনি যে নামে আমায় ডাকলেন তাতে আপনার বিবি আমার বহিন হলো। তাকে আমার সালাম দিবেন বাবু।

তারপর বাবু স্থুরু হলো চাঁদা করে' কীল। দেখ্‌লেন আমার চাম্‌ড়া কালো, আর আমি একলা আছি পাৎলা ছিপছিপে। লাঠী হাতে ছু'চারটে লালপাগড়ীও এসে হাজির। ভয়ের কোনো কারণ নেই। তখন আপনাদের সাহস দেখে কে? দমাদম চটাপট চলেছে তো চলেছেই। আমার নাক দিয়ে খুন বেরিয়ে গেল, চোখ কপাল থেঁৎলে ফুলে উঠলো, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো। কিন্তু এদিকে কি আর আমার খেয়াল আছে? আমি ধরা পড়ে গেছি মরে যাচ্ছি লজ্জায়, পাছে বেহেস্ত্ থেকে বাপ্‌জান দেখে ফেলে।

তারপর বাবু পুলিশের হাতে পড়ে' থানায় গিয়ে ফের আরেক দফা গুঁতো। বিচার হলো কাছারীতে। শুনলুম আপনারা ভদ্দর লোকেরা নাকি তাকে বলেন বিচার শালা। আমারও মনে হলো শালা-ই বটে। তারপর সেখান থেকে বাবু ছ'মাসের জন্যে জেলখানার বাসিন্দা করে দিলে।

আমার মনে বড় ছুঃখু জমেছে বাবু, ছুঃখুর কথা কইবার জন্যেই এই চিঠির ঝামেলা করছি। আপনাদের কাণ্ড দেখে

বহুৎদিন আগে শোনা গজল না খেমটা না কি একটা গান মনে পড়েছে—

"জরা ন্যায়নো সে ন্যায়নো মিলা,
আরে হাঁরে পরদেশীয়া !"

মানে—এক খুব্-সুরৎ ছুঁড়ী পরদেশীকে বল্‌ছে পিয়ার করে' চোখে চোখ মেলাতে—পরে দিল্ মেলাবার ফন্দী আর কি ! কেন বাবু এদেশী চোখ আর এদেশী দিল কি দোষ করলো, যে ন্যায়নো সে ন্যায়নো মিলাবার জন্য পরদেশীয়াকে ডাক্‌তে হয় ?

আপ্‌নাদের হয়েছে ঐ ছুঁড়ীর মত অবস্থা বাবু। আপ্‌নাদের আসল পকেট যারা মেরে মেরে ফাঁক করে' দিচ্ছে তাদের সঙ্গে পিরীত ; আর আম্‌রা যারা খুঁচরো মার্‌ছি তাদের জন্যে জমা হয়ে আছে আপ্‌নাদের বারোয়ারী কীল।

পকেট কে না মারে বাবু ? যে মারে না সে পারে না বলেই মারে না। যে ফাঁক পায় সে-ই মারে। এই দুনিয়াটাই পকেটমারের মেলা বাবু। সবাই তাকে-তাকে আছে কোন্ ফাঁকে পরের পকেট মেরে নিজের পকেট বোঝাই কর্‌বে। আজকাল দুনিয়ার লোকের তো একমাত্তর নেশা দেখ্‌ছি যেমন করে হোক্ নিজের নিজের পকেট ভর্‌তি করা ; বদ্‌নাম শুধু আমাদের বেলায় কেন ?

এই যে এই সোনার ফসলের দেশের এত মানুষ না খেয়ে শুকিয়ে মর্‌লো বাবু, এ কি করে হলো ? কাদের জন্যে হলো ?

শুধু কি চালের অভাবে বাবু? তা নয়। এক ধারে যখন লাখ লাখ মণ চাল গুদোমে গুদোমে বস্তায় বস্তায় পচেছে, তখন অন্য ধারে লাখ্ লাখ্ মানুষ এক মুঠো ভাতের জন্য বুকফাটা কান্না কেঁদে কেঁদে শেষকালে পচে মরেছে। আমাদের খুঁচ্‌রো পকেটমারের জন্যে আছে আইন, আছে পুলিশের গুঁতো, আছে আপ্‌নাদের বারোয়ারী কীল, চড়, লাথি। আর এই যে সব পাইকারী জান্-মারের দল, যারা এত চাল পচিয়ে এতগুলো জলজ্যান্ত মানুষকে জানে মেরে ফেল্লো, যাদেরকে জানোয়ার বল্‌লে জানোয়ারের অপমান হয়, তাদের জন্যে কি আছে বাবু? আইন তাদেরকে এড়িয়ে চলে, লাল-পাগড়ী তাদেরকে চোখে দেখতে পায় না, তারা খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি মোটা করে আর ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমায়; হাওয়া গাড়ী হাঁকিয়ে তারা মানুষের গায়ে ধুলোকাদা ছিটোয়, কখনো কখনো চাপাও দেয়। আর আপ্‌নারাই তাদের হাসিমুখে সেলাম ঠোকেন বাবু। বারোয়ারী কীল না হয় এদের কাছে না-ই পৌঁছোলো—এদের বাবু বয়কট করেন না কেন, ধোপা-নাপিত-মুদী-মেথর বন্ধ করেন না কেন?

কালোবাজার কি করে চল্‌চে, কারা চালাচ্ছে বাবু? এক টাকার জিনিষ দিয়ে বাগে পেয়ে গলায় পা দিয়ে পাঁচ টাকা আদায় করে নিচ্ছে যে কালোবাজারীর দল, তারা কি পকেট-মার না বাবু? তবে বারোয়ারী কীল তাদের জন্যে নেই কেন? তারা হাজার হাজার বেচারাদের সাদা করে নিজেরা

লাল হচ্ছে। যে সর্‌ষে দিয়ে তাদের ভূত ছাড়ানো যেতে পারে, সেই সর্‌ষেতেই যে ভূত আছে বাবু! কে তাদের ভূত ছাড়াবে? এমন অনেক পকেট আছে বাবু, যাদের আম্‌রা হাত-সাফাইর জোরে সাফ্‌ না করলে তারা যে জায়গায় গিয়ে খালি হতো তা আমাদের পকেটের চাইতে ভালো জায়গা নয়। সে সব জায়গার কথা না-ই বা বললুম বাবু। সাচ্চা ভদ্দরলোক আপনি। আপনার কাছে কইতে—আমি পকেটমার হ'লে কি হবে?—আমার ভি শরম লাগবে। এই ধরণের পকেট আম্‌রা সন্ধ্যেবেলা মারি বাবু। কিন্তু সেজন্যে কেউ আমাদের তারিফ করে কি?

রেলগাড়ীর কাম্‌রার গায়ে পেসিঞ্জার লোককে ইংরেজী, বাংলা, উর্দ্দু আর হিন্দীতে হুশিয়ার করে' দেয়া থাকে "পকেট-মার হইতে সাবধান"। টেরামে, বাসে, ইষ্টিশানে, ডাকঘরে, বাইশ্‌কোপ-থিয়েটারে, যেখানে সেখানে বাবু, এই হুঁশিয়ারী। কি? না, খবরদার, পকেটমার সাম্নেই আছে। আম্‌রা চুনোপুঁটি আমাদের থেকে হুঁশিয়ার হবার জন্যে যেখানে সেখানে ঢাকের বাড়ি বাবু; কিন্তু রাঘব বোয়ালদের বেলায় ঢাকের ছাউনিও মেলে না, কাঠিটীও মেলে না! এই রকম তো ব্যাপার স্যাপার বাবু আপ্‌নাদের। দেখে শুনে' তাজ্জব ব'নে গেছি।

আচ্ছা, এইবার চলি বাবু। আরো অনেক কিছু কইবার ছিল; কিন্তু অনেকক্ষণ কওয়া হয়ে গেছে, আপ্‌নার হয়তো

একসঙ্গে এত্তে বরদাস্ত হবে না। শুধু আমার এই বাৎটী মেহেরবানি করে' আপ্নার দিল্-দরোজায় সাইনবোড করে' রাখবেন বাবু, যে পকেটমার তামাম দুনিয়া-ভর কিল্‌বিল্ কর্‌ছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে যারা পকেট মারে, তারা খুঁচ্‌রো, তারাই ধরা পড়ে; আর যারা পকেটে হাত না ঢুকিয়ে পাইকারী পকেট মারে, দুনিয়ার আসল পকেটমার তারা-ই, কিন্তু তারা ধরা পড়ে না।

দিল্ বড় জবর ভারী হয়ে আছে বাবু; একটু হাল্‌কা করা গেল। গোস্তাকি হলে মাফ কর্‌বেন মেহেরবানি করে'। আপনি আমার সালাম লিবেন বাবু। বহিন্‌কে ভি আমার সালাম দিবেন।—কাল্লু শেখ।

পিনাকীলালের আত্মহত্যা

কিছুদিন যাবৎ বুঝিতেছিলাম অনেককে যেমন ভূতে পায়, পিনাকীলালকে তেমনই আত্মহত্যায় পাইয়াছে। অর্থাৎ আত্মহত্যায় যে একটা রোম্যান্স আছে তাহারই একটু আভাস পাইয়া সে আত্মহত্যার প্রেমে পড়িয়াছে।

পিনাকীলালের চরিত্র বহুদিক হইতে এবং বহুদিন হইতে এমনভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি যে, তাহা এখন

আমার কাছে অত্যন্ত স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। উঁহাকে আমি যতটা জানি অতটা আমার মাও জানেন না। পিনাকীলাল আমার ছোট ভাই।

পিনাকীলাল কবিতা লেখে না বটে, কিন্তু সে কবি। ইহা আর কেহ না জানিলেও আমি জানি; এবং জানি বলিয়াই উহার জন্য এত চিন্তা করি। কারণ যে কবি কবিতা লেখে সে তত মারাত্মক নয়—অন্তত তাহার নিজের পক্ষে নয়—কিন্তু যে কবি কবিতা লেখে না সে বড় মারাত্মক, কখন যে কি করিয়া ফেলিবে তাহা বলা শক্ত।

বলিতে নাই, তবু বলি, আমরা দস্তুরমত বড়লোক, এবং আমার জন্ম না হইলে পিনাকীলালই হইত বাবার (এবং মায়ের) একমাত্র সন্তান। আমরা দুইটি ভাই—অর্থাৎ আমি এবং পিনাকীলাল—মুখে খাঁটি সোনার চামচ লইয়া জন্মলাভ করিয়াছিলাম। কাজেই প্রেমের ব্যাপারে হতাশ হওয়া ছাড়া অন্য যে কারণে প্রধানত তরুণেরা আত্মহত্যা করিয়া থাকে সে কারণ পিনাকীলালের ছিল না। তবুও যে পিনাকীলালকে আত্মহত্যায় পাইয়াছিল তাহার কারণ—ঐ যে আগেই বলিয়াছি—আত্মহত্যায় সে রোম্যান্সের গন্ধ পাইয়াছিল।

আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম যে, কি উপায়ে আত্মহত্যা করিলে সব চেয়ে বেশি রোম্যান্টিক হয়, পিনাকীলাল যতক্ষণ চিন্তা করিবার ফুরসৎ পাইত ততক্ষণ সেই চিন্তাই করিত। শুনিয়া অনেকে হয়তো অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন, তবুও সত্য

গোপন রাখা আমার ধর্ম্ম নয় বলিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে পিনাকীলালের এই যে আত্মহত্যার সখ, ইহার সহিত হতাশ বা অহতাশ কোন প্রকার প্রেমেরই কোন সম্বন্ধ নাই। পিনাকীলালের যে বয়স এ বয়সেই বাঙালীর ছেলেরা প্রেমে পড়িতে শুরু করে। প্রেমে পড়িবার এত সুবিধা পিনাকী-লালের ছিল যে, কেন যে সে প্রেমে পড়ে নাই তাহা ভাবিয়া আমি পর্য্যন্ত অবাক হইতাম। অনর্থক ফেনাইয়া ফেনাইয়া কথা না বাড়াইয়া সোজা ভাষায় বলি, আপনারা কেহ বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, প্রেমে পিনাকীলাল পড়ে নাই, অর্থাৎ সাধারণ বাঙালী তরুণদের মত প্রেমে পড়ে নাই। কিন্তু—ঐ যে আগেই বলিয়াছি—সে আত্মহত্যার প্রেমে পড়িয়াছিল।

বাড়ির পাশেই পুকুর ছিল বটে, কিন্তু পিনাকীলাল ছিল ওস্তাদ সাঁতারু; এবং ভাল সাঁতার যাহারা জানে তাহাদের পক্ষে জলে ডুবিয়া মরা খুব সহজ নয়। বাড়িতে দড়িও ছিল, কিন্তু গলায় দড়ি দিয়া মরার মত নীরস এবং অসভ্য আত্মহত্যা পিনাকীলাল যে কিছুতেই করিবে না সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমাদের বাড়িটির মত উঁচু বাড়ি কলিকাতায় অতি অল্পই আছে; ইহার ছাত ইহাতে রাস্তায় একটিবার পড়িলেই, আমাদের পিনাকীলালেরই নিজের ভাষায়, 'আর দেখতে হবে না।' কিন্তু পিনাকীলাল হাত পা ইত্যাদি ভাঙার কথা দূরে থাক, মচকানোর কথা শুনিলেই এমন ভয় পাইত যে ছাত হইতে লাফাইয়া সে যে কোন দিন

পড়িবে না এ বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত ছিলাম। এইরূপে নানাদিক দিয়াই এত নিশ্চিন্ত ছিলাম যে আমার সেই পরম নিশ্চিন্ততাই হইয়াছিল আমার পরম চিন্তার কারণ। অনেকগুলি শূন্য একত্র হইয়াও যেমন এক হইতে পারে না, তেমনই অনেকেই মনে করিতে পারেন যে অনেকগুলি আলাদা আলাদা নিশ্চিন্ততা একত্র হইয়া একটি বিরাট চিন্তার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমার বেলায় তাহা সম্ভব হইয়াছিল। কথাটাকে আর একটু সোজা করিয়া বলা দরকার। তাই বলিতেছি, পিনাকীলাল যে আত্মহত্যার চেষ্টা করিবেই তাহা নিশ্চিত জানিতাম। কিন্তু কি ভাবে সে চেষ্টাটা হইবে তাহা অনেক চিন্তা করিয়াও ঠিক করিতে পারি নাই। সেই জন্যই মনে মনে আমার ভয় ছিল—কেন না ভূত ঠিক কেমন তাহা জানি না বলিয়াই ভূতকে আমরা অত ভয় করি, জানিলে অতটা করিতাম না।

পিনাকী আমাকে বরাবরই অত্যন্ত ভয় কবিত, এবং আমি যে অত্যন্ত একগুঁয়ে গোঁয়ার, যখন তখন যা খুশি তাই করিয়া ফেলিতে পারি, তাহা সে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিত। বিশ্বাস করিবার কারণও ছিল। একবার একটা সামান্য ব্যাপারে এক ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলেকে এমন ঘুষি লাগাইয়াছিলাম, যেমন ঘুষি কেহ তাহার চেয়ে অসামান্য বাপারেও সামান্য কেরানির ছেলেকেও মারে না। পিনাকী নিজের চোখে তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

ভাবিয়াছিলাম পিনাকীলালকে আচ্ছা করিয়া শাসাইয়া দিব। কিন্তু পরে মনে হইল শাসাইয়া লাভের চাইতে ক্ষতিই হইবে বেশি। সুতরাং নীরবই ছিলাম।

মাঝে মাঝে দেখিতাম পিনাকীলালের চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে বহু কষ্টে সে কান্না চাপিয়া আছে। আপনারা ভাবিতে পারেন পিনাকীলালের মনে কোন গভীর দুঃখ ছিল। কিন্তু আমি জানিতাম পিনাকীলালের অশ্রু সে জন্য নয়। সে মরিলে পর আমরা সবাই কি রকম ভাবে তাহার জন্য শোক করিব—তাহাই কল্পনায় দেখিয়া সে আমাদের প্রতি সহানুভূতিতে ভবিষ্যৎ আমাদের সহিত কল্পনায় যোগ দিয়া বর্ত্তমানে কাঁদিত।

পরে যাহা বলিব মনে করিয়াছি তাহারই জন্য আমার সম্বন্ধে আর একটু বলা দরকার। আমার একটা বন্দুক আছে এবং আমি শিকারী। আমি নিজে সাহসী এবং গোঁয়ার, তাই যাহারা সাহসী ও গোঁয়ার তাহাদের আমি ভালবাসি এবং যাহারা নিরীহ তাহাদের উপর আমার বেজায় রাগ। এ জন্যই সাহসী ও গোঁয়ার বাঘ সিংহ ইত্যাদিকে শিকার আমি কোন দিন করি না; নিরীহ বক, শালিক, ঘুঘু ইত্যাদির উপর আমার এত রাগ যে প্রায়ই তাহাদিগকে শিকার করিয়া থাকি।

একদিন বিকালে বন্দুক লইয়া শিকারে যাইতেছি, এমন সময় দেখিলাম পিনাকীলালের ঘরের দরজা বন্ধ এবং শুনিলাম

পিনাকীলালের কণ্ঠ। সে মৃদুস্বরে বলিতেছিল, "চলিলাম। যে দেশ হইতে কেহ ফিরিয়া আসে নাই সেই দেশে চলিলাম।" শুনিয়া তাড়াতাড়ি জানালার ধারে গেলাম। জানালাটা ভেজানো ছিল, কিন্তু যতটুকু ফাঁক ছিল তাহার ভিতর দিয়া বেশ দেখিতে পাইলাম একটা কাগজের খণ্ড হাতে লইয়া সে পড়িতেছে, "আমার জন্য কেহ দুঃখ করিও না। এই পৃথিবীর কাহারও উপর আমার কোনও রাগ, অভিমান বা নালিশ নাই। কেন চলিলাম তাহা বুঝাইয়া বলিবার সময় নাই, কারণ এখনই চলিলাম। সময় থাকিলেও ঠিক বুঝাইয়া বলিতে পারিতাম কিনা তাহা ভগবানই বলিতে পারেন। আর সময় নাই। ইতি—তোমাদের চিরহতভাগ্য পিনাকীলাল।"

কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির হইয়া এই অত্যন্ত সময়াভাবের মধ্যেই বার পাঁচেক সে ধীরে ধীরে চিঠিখানা পড়িল। তারপর আমাদের চির হতভাগ্য পিনাকীলাল একটা শিশি মুখের কাছে তুলিল। ভয় হইল, হয় তো পটাসিয়াম সায়ানাইডের গুঁড়া। মুখে একবার গেলেই পিনাকীলালকে পিনাকী-লালেরই ভাষায়, 'আর দেখতে হবে না।' আর দেরি নয়, যা করার এই বেলা। এক ঠেলায় জানালাটা খুলিয়া ফেলিয়া বন্দুকের নলটা তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া কঠোর মুখে এবং অশনি-গম্ভীর স্বরে বলিলাম, "খবরদার পিনাকী। আর হাত উঠিয়েছ কি গেছ।" পিনাকী থমকিয়া আমার দিকে তাকাইল।

বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল রাখিয়া যে কোন মুহূর্ত্তেই তাহা টিপিতে পারি এই ভাব দেখাইয়া কহিলাম, "শিগগির ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দাও, নইলে শেষ ক'রে ফেলব। শিগ্‌গির, ওয়ান—টু—"

থ্রী বলিবার আগেই পিনাকীলাল শিশিটা ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

মিথ্যার স্বর্গ

সেদিন বিকেলবেলা বেড়াইতে বাহির হইবার সময় প্রতিজ্ঞা করিলাম, পরদিন ভোরবেলা পর্য্যন্ত আর মিথ্যা কথা কহিব না। কারণ গত কয়েকদিন যাবৎ মিথ্যা কথা কহিতে কহিতে জ্বালাতন হইয়া গিয়াছিলাম। মিথ্যা কথা কহিয়া তৃপ্তি আছে সত্য; কিন্তু সে তৃপ্তি বাস্তবিক উপভোগ করেন তাঁহারাই, যাঁহারা মিথ্যা কথাকে চাটনির মত ব্যবহার করেন। আমার মিথ্যা ছিল আটপৌরে, কাজেই মিথ্যায় যে রোম্যান্স আছে তাহা ক্রমশ ভুলিয়া যাইতেছিলাম। জীবনে প্রথম মিথ্যা কথা বলিবার সময় কি উৎকট রোমাঞ্চ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা মনে করিয়া মিথ্যাকে আবার রোম্যান্টিক

করিবার জন্য সেদিন বিকালবেলা বাহির হইবার সময় উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা করিলাম।

প্রতিজ্ঞাটা অবশ্য মনে মনেই করিয়াছিলাম; কিন্তু অন্তর্যামী ভগবানকে ঠকাইবার জো নাই। তিনি টের পাইয়াই আমার পথে নানা প্রলোভন পাঠাইতে লাগিলেন। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে আসিতেই বীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা এবং তাঁহার সেই চিরন্তন প্রশ্ন, "নমস্কার অজিতবাবু! আছেন কেমন? ব্যবসা চলছে কেমন?"

ইচ্ছা হইল, তাঁহার এই চিরন্তন প্রশ্নের আমার সেই চিরন্তন জবাব দিই, "আর বলবেন না বীরেনবাবু, দুঃখের কথা। দেখছেন তো শরীরের হাল! আর বাজার যা মন্দা!" কিন্তু প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়াতে প্রচণ্ড লোভ সামলাইয়া নিয়া বলিলাম, "কিছুদিন যাবৎ শরীরটা ভারি ভাল যাচ্ছে। আর ব্যবসাটাও মশাই, ভারি জাঁকিয়ে উঠছে। এই তো কাল একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্ডার পেয়েছি। তাতে কম-সে-কম সাড়ে বারো পারসেণ্ট লাভ থাকবে।" বীরেনবাবু আমার সত্যকেই খুব সম্ভব মিথ্যা মনে করিয়া চলিয়া গেলেন। আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আরেকটুক্ষণ আলাপ হইলেই হয়তো লোভ সামলাইতে না পারিয়া দুই একটা মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিতাম।

দেশবন্ধু পার্ক ছাড়াইতেই নীহারদার সঙ্গে দেখা। নীহার-

দা কহিল, "কি রে অজিত? আমাদের ওদিকে যে আর যাস না। আমাদের বুঝি ভুলেই গেলি?"

নীহারদাকে সরলভাবে জানাইলাম যে বাস্তবিকই গত তিন বা সাড়ে তিন মাসের মধ্যে একটিবারও তাহার কথা আমার মনে হয় নাই। শুনিয়া নীহারদা অবাক, এবং বোধ হয় ব্যথিতও হইয়া চলিয়া গেল। আমিও নিজের সত্য কথা বলিবার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেলাম। মানুষ প্রতিজ্ঞা করিলে যে অসাধ্যও সাধন করিতে পারে, তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিলাম।

এরূপ বহু প্রলোভন জয় করিতে করিতে প্রফুল্ল মনে অগ্রসর হইলাম। সত্য কথার চাটনির স্বাদ তখনও জিহ্বায় লাগিয়া আছে।

অবশেষে দ্বারিক ঘোষের দোকানের গজ কয়েক আগে আসিতেই পুরাতন বন্ধু বারিধির সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। তিন চার বছর পর সেই তাহাকে প্রথম দেখিলাম। কিন্তু সেজন্য চিনিতে বেগ পাইতে হইল না, কারণ তাহার চেহারা অপরিবর্ত্তনীয়। তেমনই মিশ্‌কালো গায়ের রং, চক্ষু দুইটি তেমনই সুগভীর, দেহটি তেমনই আমচুরের মত, এবং তাহার সারা দেহ ঘিরিয়া একটা অবর্ণনীয় হতাশার ধোঁয়া।

চিরদিনই বারিধির এই বিশ্বাস যে তাহার মধ্যে একটা অসাধারণ প্রতিভা আছে; দেশের লোক সেই প্রতিভার মর্য্যাদা বুঝিল না বলিয়াই সে বেকার। এবং যেখানে

প্রতিভার কোনও আদর নাই। সেই পোড়া দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া সে যখন তখন তাহার পোড়া-কপালকে ধিক্কার দিত।

বারিধির ভিতরে যে কিসের প্রতিভা ছিল, তাহা বহু চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। তবু, কি জানি কেন, তাহার প্রতি আমার বরাবরই সহানুভূতি ছিল।

আমাকে দেখিয়াই সে কান্নার চেয়ে করুণ মলিন হাসি হাসিল। বুঝিতে বাকি রহিল না যে এখনও সে বেকার। বস্তুত সে যে বেকার ছাড়া আর কিছু হইতে পারে, তাহা আমি কল্পনাই করিতে পারিলাম না।

মামুলি ধরণের প্রাথমিক আলাপের পর অল্প জেরা করিতেই (যদিও জেরা করিবার বিশেষ দরকার ছিল না) জানিলাম, এখনও দেশ তাহার প্রতিভার সম্মান দেয় নাই, ফলে সে বেকারই আছে। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "আমাদের সেই প্রবীরের কথা তোমার মনে আছে তো? সেই যাকে আমরা ইস্কুলে থাকতে ইডিয়ট ব'লে ক্ষেপাতুম?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, মনে আছে। কি হয়েছে তার?"

বারিধি বলিল, "কাল তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ছোকরা টমাস এণ্ড কোম্পানীতে মস্ত চাকরি পেয়ে গেছে।"—বলিয়া সে এমন একটা করুণ নিঃশ্বাস ফেলিল যে বারিধির জন্য আমার প্রায় কান্না আসিতে লাগিল।

অবশেষে যখন সে অত্যন্ত সঙ্কোচ ও ভয়ের সহিত জিজ্ঞাসা

করিল, আমি বর্ত্তমানে কি করিতেছি, তখন মহা সঙ্কটে পড়িয়া গেলাম। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গেলে বারিধির মন ভাঙিতে হয়; এবং বারিধির মন রক্ষা করিতে হইলে প্রতিজ্ঞা ভাঙিতে হয়। ইডিয়ট প্রবীরের নিকট হইতে নিদারুণ আঘাত পাইয়া তাহার ঠিক পরদিনই আমার কঠোর সত্যের আঘাত যে সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না, তাহা তাহার করুণ মলিন মুখখানা দেখিয়াই বুঝিলাম। সুতরাং প্রতিজ্ঞা ভাঙাই ঠিক করিলাম। মুখখানাকে যথাসম্ভব মলিন করিয়া যথাসম্ভব করুণ স্বরে কহিলাম, "আর ব'ল না ভাই, দুঃখের কথা। এত বছর ধ'রে চাকরির জন্যে কিছু করতে আর বাকি রাখি নি। তবু যে বেকার সেই বেকার। জীবনটার ওপর ধিক্কার জন্মে গেছে।" আমার পরণে যে পোষাক ছিল জীবনের প্রতি ধিক্কার না আসিলে সে প্রকার পোষাক সাধারণত কেহ পরে না। কাজেই আমার কথা বারিধি অতি সহজেই বিশ্বাস করিল।

মুহূর্ত্তের ভিতর তাহার ঠোঁটে হাসি ফুটিয়া উঠিল। নির্জীব বারিধি যেন নূতন প্রাণ পাইল। এইবার নিজের দুঃখ ভুলিয়া সে আমাকে দুঃখ ভুলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আমাকে ভরসা দিয়া বলিতে লাগিল, "যাক গে। কুছ পরোয়া ক'র না ভাই। দুঃখের ভেতর দিয়েই তো আসল জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যে আমি এদ্দিন ধ'রে বেকার, পয়সার অভাবে ট্রামে বাসে চড়ি না, পান সিগারেট পর্য্যন্ত খাই না— একটা পয়সা যে এখন আমার কাছে একটা মোহরের সমান,

সে জন্যে কি আমি দুঃখ করি? কিস্সু না।” তারপর রবিবাবুর কয়েক লাইন কবিতা আওড়াইল—

> “বন্ধু! কিসের লাগি' অশ্রু ঝরে,
> কিসের লাগি' দীর্ঘশ্বাস?
> হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
> কর্‌ব মোরা পরিহাস।
> নিঃস্ব যারা সর্ব্বহারা
> সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা......”

কথা কহিতে কহিতে দুইজনে একসঙ্গে কিছুক্ষণ চলিলাম। অবশেষে দ্বারিক ঘোষের খাবারের দোকানের সামনে আসিয়াই বারিধি হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর পকেট হইতে সমস্ত পয়সা বাহির করিয়া গুনিয়া দেখিল—মোট দুই আনা আছে। আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সে আমাকে এক রকম টানিয়াই খাবারের দোকানে ঢুকাইয়া দুইটি প্লেটে চারখানা করিয়া কচুরির অর্ডার দিয়া বসিল। অগত্যা খাইতেই হইল, কিন্তু নিঃস্ব বেকার বন্ধু বারিধির যে অকারণে আটটি তামার মোহর তাহার পকেট খালি করিয়া ধনী দ্বারিক ঘোষের পকেটে চলিয়া যাইবে, সে কথা ভাবিয়া মনটা কেমন কেমন করিতে লাগিল। মিথ্যা কথা বলিয়া বারিধির এই মহা লোকসানটি করাইলাম, এজন্য বিবেকেরও মৃদু তাড়া খাইতে লাগিলাম। কিন্তু মিথ্যা না বলিলে যে ইহা অপেক্ষাও ক্ষতি হইত তাহার, তাহা ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইলাম। ইচ্ছা হইতেছিল, পয়সাটা আমার পকেট

হইতেই বাহির করিয়া দিই, কিন্তু বেচারা বারিধির মুখ চাহিয়া সে ইচ্ছাকে দমাইয়া রাখিলাম।

বাহির হইয়া অল্পদূর অগ্রসর হইতেই প্রমাদ গণিলাম, দালাল পীতাম্বরবাবুকে দেখিয়া। মিথ্যার স্বর্গ হইতে সত্যের এক খোঁচাতে লোকটা বারিধিকে বাহির করিয়া না দেয়। লোকটাকে এড়াইতে চাহিলাম, কিন্তু এড়াইতে পারিলাম না। কাছাকাছি আসিয়াই তিনি কহিলেন, "এই যে নমস্কার বাবুমশাই। ঐ বারো পারসেণ্টই ঠিক হ'ল। আপনি ধার দেবেন বারো হাজার টাকা, আর যে বাড়ি আপনার কাছে মর্‌গেজ থাকবে তার দাম এ বাজারে পঁয়তাল্লিশ হাজারের কম হবে না।" তারপর আরও কাছে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমার কানে কানে কহিল, "ও ব্যাটা যে টাকা শোধ দিতে পারবে তা তো মনে হয় না। শেষকালে ও বাড়ি আপনারই হয়ে যাবে।"

চিন্তিত হইয়া অনাদৃতপ্রতিভা বারিধির দিকে তাকাইয়া বুঝিলাম, সে আমার মিথ্যাচরণ বুঝিয়া গিয়াছে। একটু আগেই তাহার মুখে যে প্রসন্ন হাসি দেখিয়াছিলাম, তাহা অদৃশ্য হইয়া সেখানে যাহা আসিয়াছে তাহা কান্না অপেক্ষাও করুণ। কি করা যায় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ ক্রন্দনভরা কণ্ঠে বারিধি কহিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আসি ভাই অজিত। এই পাশের গলিতেই আমার একটু কাজ আছে।"—বলিয়াই কান্না চাপিতে চাপিতে বারিধি চলিয়া গেল।

পিছন হইতে ডাকিলাম, "বারিধি, শোন, শোন।"

কিন্তু বারিধি পিছনও ফিরিল না, সাড়াও দিল না। দ্রুত-বেগে গলির ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।